অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, বারাণসী-১০

উপক্রমণিকা

—*—

মনুষ্যত্বই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ বৈভব, মনুষ্যত্বের সাধনাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মনুষ্যগৃহে ভূমিষ্ঠ যাহারা এই সাধনা করিল না, এই সম্পদ লাভের চেষ্টা পাইল না, বলিতে হইবে, তাহাদের নরজন্ম-লাভই বৃথা হইয়াছে, পশু, পক্ষী বা সরীসৃপ হইয়া যদি তাহারা জন্মিত, তাহা হইলেও কিছু ইতর-বিশেষ হইত না। ক্ষুধা লাগিলে সহজ-প্রাপ্য ভোজ্যে উদর পূর্ণ করিয়া নিদ্রাদেবীর পদাশ্রয় গ্রহণ ও সুখলোভাতুর হইয়া নিকৃষ্ট চরিতার্থতার প্রার্থনা,—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই সমভাবে রহিয়াছে। মানুষ রূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া যদি এই পশু-সামান্য গুণগুলির প্রভাব বর্জ্জন করিয়া চলিতে না পারিলাম এবং সম্যগ্‌রূপে বর্জ্জন করিতে পারি আর না পারি, অন্ততঃপক্ষে এইগুলিকে নিজের উপর প্রভুত্ব করিতে দিতে অস্বীকৃত হইয়া প্রাণপাত চেষ্টা একবার না করিয়া দেখিলাম, তবে কিসের আমি মানুষ?

মোট কথা, পশুতে আর মানুষে একটা পার্থক্যের সীমা রেখা আছে। সেই সীমা-রেখাটী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেই মনুষ্য আখ্যার যোগ্য হওয়া যায়, না পারিলে পশুই থাকিয়া যাইতে হয়। মনুষ্য-ভাষায় সম্ভবতঃ

আজ পর্য্যন্ত পশু ও মানুষের পার্থক্যটা ঠিক ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই, কিন্তু যখন কাহারও মধ্যে মনুষ্যত্বের পরম-শ্লাঘ্য সম্পদ সঞ্চিত হয়, তখন বুদ্ধির বলে আমরা কিছু না বলিলেও হৃদয়-বৃত্তির চঞ্চল সম্বর্দ্ধনার মধ্য দিয়া তাহা টের পাই এবং স্বভাবতঃই উচ্চ শির তাঁহার পায়ে লুটাইয়া দেই। তবে, মনুষ্যত্বের বৈভব-স্তূপে কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে যাঁহারা দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদের জীবনে এই একটী বিশেষত্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মসুখে অনাদরকারী, প্রত্যেকেই পরার্থে উৎসর্গীকৃত-সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের এই ত্যাগের জন্যই আমরা তাঁহাদের চরণরেণু মাথায় ধরিয়া আনন্দ পাই কি না, অথবা অন্য কোনও অদৃশ্যশক্তি তাঁহাদের মধ্যে জন্মে, নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, কিন্তু একথা অভ্রান্ত যে, মনুষ্যত্ব-ব্যঞ্জক যতগুলি বিশেষত্ব তাঁহাদের জীবনের মধ্যে খুঁজিয়া পাই, তন্মধ্যে পরার্থে নিজ-সুখ জলাঞ্জলি দেওয়ার মত বড় বিশেষত্ব আর কিছুই নাই। তাঁহাদের জ্বলন্ত ত্যাগ যে বহ্নি বিকিরণ করে, ধন-সম্পদ, বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য, রূপ-যৌবন প্রভৃতি তাহার তুলনায় একান্তই তুষার-শীতল। ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ কত লোক ত' তাঁহাদের কত রাজসিক আড়ম্বর করিয়া কালের করাল গর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছে, কিন্তু কৈ সার্থকনামা মনুষ্য-পংক্তিতে ত' আজ তাহাদের জন্য ক্ষুদ্র একখানা ছিন্ন আসনও কেহ পাতিয়া রাখে না। কত জন ত' বিদ্যাবত্তার কত

ফোয়ারা ছুটাইয়া, কত জন ত' রূপ-যৌবনের কত লহর তুলিয়া চিরতরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কৈ, তাহাদের জন্য প্রাণ ত' আমাদের কাতর হইয়া কাঁদিয়া উঠে না। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর এক ফোঁটা বুকের রক্ত, আবার পরদুঃখকাতর বুদ্ধের একবিন্দু চোখের জল যেমন করিয়া হৃদয় উজাড় করিয়া দেয়, চিত্ত-বৃত্তিগুলিকে যেমন করিয়া উন্মত্ত করিয়া তোলে, কোন্ ধনবানের, কোন্ জ্ঞানবানের, কোন্ রূপবানের স্মৃতি তেমন করিয়া আমাদিগকে বিহ্বল করিতে পারে? প্রাচীন রোমের ঐশ্বর্য্যমত্ত বিলাসি-বিলাসিনীরা একদিন একপাত্র ভোজ্যের রাজসিকতা রক্ষার জন্য কোটি মুদ্রা অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্যয়িত করিয়া কতই না সন্তোষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহাদেরই সেই স্মৃতি কাহার হৃদয়-সমুদ্রকে এমন করিয়া মন্থন করে? সুন্দরী-কুল-শিরোমণি ক্লিওপেট্রার রূপের জ্যোৎস্নায় শুধু নাইল নদীই নহে, সমগ্র ভূমধ্যসাগরের জলরাশি যৌবন-প্লাবনে উথলিয়া উঠিত, কিন্তু তাহার জন্য আজ কাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠে?—মানবতার আবেদন যখন আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে, তখন ইহাদের কথা স্মৃতির কোণেও জাগে না।

অধিক কি, কালিদাসের সুমোহন কবিতাবলির জন্য উজ্জয়িনীর প্রাসাদে প্রাসাদে প্রতি বাতায়ন উৎকর্ণ হইয়া থাকিত, দ্বাপরের সেই শাশ্বত-বংশীর ন্যায় যাঁহার কাব্য-মুরলীতে

শিপ্রার জলরাশি উজান বহিত, আজও যাঁহার অবিনশ্বর কাব্য-সুধা ভূমণ্ডলের প্রতি পিপাসু রসনার পরম-প্রার্থনার সামগ্রী, সেই কালিদাসের মহাকবিত্বকে যখন ত্যাগবীর বুদ্ধ বা যীশুর এক ফোঁটা নয়নাশ্রু বা হৃদয়-রক্তের সহিত তোল করি, তখন তাহা যেন নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত নগণ্য, নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু বলিয়া মনে হয়। তখন মনে হয় যদি বুদ্ধেরই মত দুঃখার্ত্ত-জীবকুলের জন্য সহানুভূতিতে গলিয়া প্রাণ খুলিয়া সমগ্র জীবনে একটী মুহূর্ত্তও কাঁদিবার অধিকার পাই, মানব-জাতির পাপ-তাপ-প্রশমনের জন্য যীশুর মত একদিনের জন্য এক রতি শোণিতোৎসর্গ করিতে পারি, তবে কালিদাস, ভবভূতি, গেটে, সেক্স্পীয়র, হোমার, ভার্জ্জিল ইঁহাদের সকলের কবি-প্রতিভা একত্র পাইলেও তাহা চাহি না, চাহি না, চাহি না। মনুষ্য-সমাজে যাঁহারা পিকরাজ, দুঃখ বর্ষার অবিরাম বর্ষণেও যাঁহারা কণ্ঠের কাকলীতে চিরবসন্তকে বাঁচাইয়া রাখেন, শীতের প্রবল পীড়নেও যাঁহারা আশার ঝঙ্কারে মানবের সংগ্রাম-কুশলতাকে রক্ষা করেন, সেই কবিকুল জগতে চিরনমস্য। কিন্তু তথাপি মনে হয়, দধীচির মত যদি জগতের হিতার্থে নিজ অস্থি দান করিতে পারি, তবে কবিগুরু বাল্মীকির তপঃসিদ্ধ বীণাও আমার ক্ষণেকের জন্য প্রলোভনের বস্তু নহে! মানবতার পূজা-মন্দিরে কবিদের জন্যও স্থান আছে, কিন্তু পরার্থে-জীবনোৎসর্গকারীর স্থান সর্ব্বোপরি। অবশ্য

একথা আমি ভুলিয়া যাইতেছি না যে, বাল্মীকির বীণা যে তপঃসিদ্ধ হইল, সে শুধু পরদুঃখকাতরতার দৈবী সম্পদে।

আমরা যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, তখন মনুষ্যত্বের চিরন্তন অধিকারও নিঃসন্দিগ্ধভাবেই লইয়া আসিয়াছি। নিজেদের মধ্যেই আমরা অপরিমেয় গুপ্তধনের সঞ্চয় লইয়া আসিয়াছি, দুহাত কষিয়া কোদাল আমরা ধরিব কি না, মাটী খুঁড়িয়া সে ধন আমরা বাহির করিব কি না এবং তাহা আমরা মানব-কল্যাণকর নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করিব কি না, ইহা আমাদেরই ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। চারিদিকের মনুষ্যমূর্ত্তিগুলির মুখের দিকে তাকাইয়া যখন আমরা হতাশার মসীকৃষ্ণ প্রগাঢ় প্রলেপ ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না, তখন হয়ত একথা বিশ্বাস নাও করিতে পারি যে, আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে অনন্ত উন্নতির সীমাহীন সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টিকে বাহিরের দিক হইতে টানিয়া আনিয়া যদি অন্তরের দিকে প্রেরণ করি, তাহা হইলে আমাদের চিত্তবৃত্তি-গুলির চঞ্চলতার মধ্যে নানা অসঙ্গতি দৃষ্ট হইলেও সামান্য আয়াসেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহার মধ্যেও কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, আমাদের জীবনের ব্যর্থতাগুলিও কোনও না কোনও সার্থকতার সৃষ্টি করিতেছে। তপস্যার অভাবে প্রথম সময়ে আমরা এই সামঞ্জস্যটুকুকে স্পষ্ট করিয়া ধরিতে ছুঁইতে পাই না বটে, কিন্তু একাগ্র

সাধনার শক্তি ধীরে ধীরে উহাকে আমাদের গোচরীভূত করে। যখন তাহার শত প্রকার চঞ্চলতা নিয়া মানুষকে বিব্রত করিতেছে,—কখনও দীন-দুঃখীর জন্য সহানুভূতিতে অধীর করিয়া তাহাকে পীড়িত করে, কখনও সুখ-লালসার তীব্র হলাহলে প্রতপ্ত করে। কখনও মনের চঞ্চল আবেগ মানুষকে তাহার মুখের নিশ্চিন্ত গ্রাসটী ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর অলভ্যের মায়া-মরীচিকায় চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরাইয়া মারে, কখনও তাহার মনের স্থবিরতা তাহাকে সহজপ্রাপ্য ক্ষণিক সুখের চরণ-তলায় বাঁধিয়া রাখিয়া কষ্টলভ্য নিত্যসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইতে পরাঙ্মুখ করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের সম্যক্ বিনাশ না হইতেছে, ততক্ষণ এই ভাবে সে নানা বিরোধী অবস্থা-নিচয়ের মধ্য দিয়া মানুষটিকে পরিচালিত করিতেছে, আর মনের মর্কট নৃত্যের সহিত সমান তালে পা ফেলিতে না পারিয়া অতত্ত্বজ্ঞ মানব নিজেকে অক্ষম, দুর্ব্বল ও অশক্ত বলিয়া গালি দিতেছে। কিন্তু গালি দিয়াই মানুষ নিজেকে চিরতরে ছোট করিয়া রাখিতে পারে না। তাই, ক্ষণকাল পরেই আবার সে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠে,—"হউক না আমার মন চঞ্চল, হউক না আমার চিত্তবৃত্তিগুলি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন, তথাপি ইহারা আমার, আমি ইহাদের নহি ; আমি না থাকিলে ইহাদের অস্তিত্ব অর্থহীন ; ইহারা না থাকিলেও আমার অস্তিত্ব অসম্ভব নহে।"

উপক্রমনিকা

আমিত্বের এই ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যখন মানব তার মনের ক্ষুদ্রতা ও মহত্ত্ব, সঙ্কীর্ণতা ও প্রসার, পাপপ্রবণতা ও পুণ্যশীলতা প্রভৃতি বিচার করে, তখন অস্পষ্টভাবে হইলেও সে বুঝিতে পারে যে, যে সকল চিত্তবৃত্তির মধ্যে আপাততঃ বিরুদ্ধ সম্বন্ধই দেখা যাইতেছে, কি যেন একটা অপ্রত্যাশিত, অপরিকল্পিত এবং অদৃশ্য এক সামঞ্জস্য তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। যে মনটি এই মুহূর্ত্তে স্বার্থলোলুপতায় এবং আত্ম-পরায়ণতায় পর-রুধির-পাতে দ্বিধাপীড়িত নহে, সেই মনটিই কিয়ৎকাল পরে যে তুচ্ছ একটা অতি নগণ্য জীবের তুচ্ছতর একটা দুঃখের নিরসন-কল্পে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না,—এই আশ্চর্য্য বিরোধিতার মধ্যে তখন কি যেন একটা আশ্চর্য্যতর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়। যে মনটী কামমোহে মুগ্ধ হইয়া প্রিয়জনের সুখ অপেক্ষাও নিজ সুখকে অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিতেছে, সেই মনটীই কিয়ৎ-কাল মধ্যে কি করিয়া প্রেমধর্ম্মী হইয়া প্রিয়জনের সুখের জন্য নিজ সুখকে বিসর্জ্জন দিতে পারিল, এই বিচিত্র বৈপরীত্যের মধ্যে তখন মানব কি যেন একটা বিচিত্রতর মিলনের সম্বন্ধ আবিষ্কার করে। তপঃসাধনের অভাব এই সামঞ্জস্যের অনুভূতিকে অস্পষ্ট, অগভীর ও অচিরস্থায়ী করে, পরন্তু তপঃসাধনার প্রাচুর্য্য ইহাকে সুস্পষ্ট, সুগভীর ও সুচিরস্থায়ী করে।

মানুষ যখন শত বিরোধের মধ্য হইতে সামঞ্জস্যকে চিনিয়া লইতে পারে, তখনই তাহার সকল দুঃখের মুক্তি। জীবনের কাম ও জীবনের প্রেম-টুকুর বিরোধিতা তাহাকে যে কঠিন পেষণে চূর্ণ করিতে চাহিতেছে, কাম ও প্রেমের সামঞ্জস্যটুকু বুঝিতে পারা মাত্র সেই পেষণের যন্ত্রণা ফুরাইয়া যায়। জীবনের ভোগ ও জীবনের ত্যাগটুকুর দোটানা তাহাকে যে কঠোর নির্য্যাতনে পীড়িত করিতেছে, ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যটুকু খুঁজিয়া পাওয়া মাত্র, সেই কষ্টের চিরাবসান ঘটে। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের সাক্ষাৎকার ত' বচন-বিভ্রমে হইবে না। তাহার জন্য চাই উদগ্র, একাগ্র, ব্যগ্র সাধনা।

এই কথাটুকু বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তত্ত্বদর্শী প্রাচীন ঋষিগণ মানবজীবনকে চারিটী অংশে বিভক্ত করিয়া চারিটী বিশিষ্ট অনুশাসন করিয়াছিলেন,—কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য। জীবনের এই চারি অংশের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সাধনাকে অপরিহার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের শস্ত্রবর্জ্জিত শাসন ভারতবর্ষকে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দলে দলে সংসার-বিরাগী মুমুক্ষু যতি সৃষ্টি করিয়া ভারতের সুনীল আকাশ আর শ্যামল প্রান্তর গেরুয়ায় রঙ্গাইয়া দিবার দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না, আবার পঙ্গপালের ন্যায় গৃহীপাল সৃষ্টি করিয়া মানব-মাত্রেরই পিণ্ড-লোপাশঙ্কা দূর করিবার

জন্যও তাঁহাদের কোনও অনুচিত আগ্রহ ছিল না। জীবের দুঃখনাশই তাঁহাদের পরম প্রার্থনীয় ছিল এবং জাগতিক জীবনে দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে না পড়িয়া যে কাহারও গতি নাই, এই কথা তাঁহারা নিশ্চিত-রূপে জানিতেন। তাই জীবকে দুঃখজয়ী করিবার জন্যই বিভিন্ন বয়সে, অথবা মনের বিভিন্ন অবস্থায় তদুচিত সাধনার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, সাধন-মাত্রেই সিদ্ধির পথে চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতা-সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, সুতরাং দুঃখ-নাশ করে। এই জন্যই তাঁহারা চারিটী আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য-সমূহ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে ঋষি-প্রবর্ত্তিত আশ্রম-ধর্ম্ম প্রচলিত নাই অথচ আমাদের মানুষ হইবার প্রয়োজন আছে, মনের বিরুদ্ধ বৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যকে অনুভব করিয়া নিশ্চিন্ততা লাভ করিবার প্রয়োজন আছে, আক্রোশ-গর্জ্জন-বহুল দুঃখের সহস্র ঘাত-প্রতিঘাত স্বীকার করিয়াও দুঃখজয়ী হইবার প্রয়োজন আছে। তাই, পুনরায় আমাদিগকে আশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং যুগধর্ম্মের মুখ চাহিয়া কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলেও ব্রহ্মচর্য্যকে সকল মতাবলম্বীর, সকল পথাবলম্বীর এবং সকল আদর্শবাদীরই পক্ষে অবশ্য-প্রতিপাল্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাঁহারা মনের অস্তিত্ব ধ্বংস করিয়া দিয়া দুঃখের হাত এড়াইতে চাহেন, আর

যাঁহারা মনের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াই ইহার শত প্রকারের চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়া দুঃখজয়ের উপায় লাভ করিতে চাহেন, যাঁহারা ঐহিক সুখকে অগ্রাহ্য করিয়া পরম-সুখকে প্রাপ্ত হইতে চাহেন, আর যাঁহারা ঐহিক সুখকে গ্রহণ করিয়া ইহারই মধ্য দিয়া পরমা-তৃপ্তির রসাস্বাদন করিতে চাহেন,—ইঁহাদের সকলেরই সকল সাধনের মূলে অবিরোধিভাবে ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যিনি দেশমধ্যে যে প্রকার আন্দোলনই সৃষ্টি করিতে চাহেন না কেন, কাহারও আন্দোলনের সহিত বিন্দুমাত্র সঙ্ঘর্ষে না আসিয়া ব্রহ্মচর্য্যের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমের একটী পৃথক্‌ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী লোক-মতকে অনুকূল করিতে হইবে, এবং যুগে যুগে প্রয়োজনে ধারা অনুসন্ধান করিয়া আপদ্ধর্ম্মের দাবী বুঝিয়া, বিভিন্ন ভাবে দেশের যুবক-শক্তিকে মনুষ্যত্বের বিকাশ-চেষ্টায় সহায়তা দিতে হইবে।—কিশোরী এবং যুবতীদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়-জয়ের আন্দোলনকে সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিয়া সমাজের একাঙ্গ-বাতব্যাধির প্রতিকার করিতে হইবে সত্য কিন্তু সে আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবেন যাঁহারা, তাঁহারা পুরুষ নহেন, তাঁহারা মাতৃজাতীয়া।

বলাবাহুল্য, ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-বিশেষে

সংগঠনের ভণ্ডামী-বহুল প্রচেষ্টায় পরিণত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের প্রয়াস বহু স্থলে অপরিণত-বুদ্ধি অথচ ভাবপ্রবণ যুবকগণের উপরে ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচ্ছন্ন উপায়রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের নাম করিয়া অনেক স্থলে শুধু নর্ত্তন-কুর্দ্দন-বিলাসী, সংযমে অপ্রতিষ্ঠিত, কঠোর কর্ম্মে পরাঙ্মুখ, জীবন-সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে ভীত একপাল অলস ও অকর্ম্মণ্যের আড্ডাও গড়িয়া উঠিতে পারে। ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় দৃঢ়বীর্য্য সত্যের সাধন অনেক সময় কর্ম্মকুণ্ঠ পরান্নজীবীর সংখ্যা-বর্দ্ধনেই পর্য্যবসিত হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মচর্য্যের আন্দোলনকে যে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতার সহিতই পরিচালিত করিতে হইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ত্বরিত সেই সকল মহাসত্ত্ব দৃঢ়কর্ম্মা মহাত্মগণের আবির্ভাব ঘটুক, যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যকে অসত্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার আপোষ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন।

"ব্রহ্মচর্য্যই ভারতের অভ্যুদয়ের মূলমন্ত্র।"

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—

ওঁ

আদর্শ ছাত্র-জীবন

প্রাতরুত্থান

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা যাহাদের ব্রত, তাহাদের পক্ষে সকল সদাচারের মূল সদাচার এই প্রাতরুত্থান। রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিতে প্রথম-অভ্যাসকারীর পক্ষে কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শয়নকালে যদি সঙ্কল্প করিয়া শয়ন কর যে,

[১] রাত্রি থাকিতে জাগিবেই,

[২] একবার জাগিলে কিছুতেই আর আলস্য করিয়া পড়িয়া থাকিবে না,

তাহা হইলে দিন চারি পাঁচ যাইতে না যাইতেই দেখিতে পাইবে যে, যথাকালে শয্যাত্যাগ একটা অতি সহজ ব্যাপার।

রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অথবা যাহাদের নিদ্রা অতিশয় পাতলা, তাহাদের পক্ষে, শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শেষ রাত্রিতে যে নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ বহিতে থাকে, তাহাতে আয়ু বর্দ্ধিত হয়। এবং চক্ষু, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর স্নিগ্ধতা সম্পাদিত হয়। সুতরাং এই কল্যাণপ্রদ

বায়ু সেবনের জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে রাত্রিজাগরণ-বর্জ্জন ও নিদ্রার গাঢ়ত্ব-সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া পড়াশুনা করাও এক প্রকারের মূর্খতা। আগ-রাত্রিতে নয়টা দশটার মধ্যে যতটুকু পড়া সারিয়া বাকী পাঠটুকু শেষ রাত্রিতে প্রস্তুত করাই ব্রহ্মচর্য্যরক্ষার্থীর কর্ত্তব্য। শেষ রাত্রিতে দেহ সাম্যাবস্থায়, মন স্থির, এবং জগৎব্রহ্মাণ্ড নিঃস্তব্ধ থাকে। সে সময়ে অল্প শ্রমে অল্প সময়ে অধিক বিষয় শিক্ষা করা যায়।

শেষ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিবার অভ্যাস হইলে নিদ্রাযোগে বীর্য্যস্খলনের সম্ভাবনাও কমিতে থাকে। সূর্য্যোদয়ের দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ধরণীর শীতলতা কমিতে থাকে, একটা অস্পষ্ট উষ্ণতা সঞ্জাত হইয়া জীবকুলের নিদ্রার গভীরতা হ্রাস পাইতে থাকে। নিদ্রার এই অগভীর অবস্থাতেই দেহের মধ্যে নানা কারণে উত্তেজনা জন্মিয়া সাররূপী শুক্র কখনও স্বপ্নাশ্রয়ে, কখনও বা বিনা-স্বপ্নে নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং শেষ রাত্রিতে জাগরণই ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিতে ঠিক কোন-সময় জাগিতে হইবে, তাহা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম-অভ্যাসীর পক্ষে রাত্রি অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিতে উঠাই সঙ্গত। যাঁহারা দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকৃষ্টরূপে অভ্যস্ত,

তাঁহারা রাত্রি তিনটায় শয্যাত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। তবে শয্যাত্যাগের উৎকণ্ঠায় যদি কাহারও ইহার পূর্ব্বে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা হইলে পুনরায় শয্যায় শয়নও কর্ত্তব্য নহে। মেরুদণ্ড সরল করিয়া বসিয়া নাম জপ করিতে করিতে নিদ্রাবিষ্টভাবে কাটাইবে অথবা একান্ত না পারিলে জানালা হেলান দিয়া বসিয়া ঘুমাইবে। কেননা, শুইয়া ঘুমাইলে বীর্য্যক্ষয়ের যেরূপ সম্ভাবনা, বসিয়া ঘুমাইলে সে সম্ভাবনা তাহা অপেক্ষা কম।

রাত্রিতে অসময়ে জাগিলে বড়ই অসুবিধা, ঘুমানও বিপদ, না ঘুমানও বিপদ। এমতাবস্থায় শয়নকালে সঙ্কল্প করিবে যে, কিছুতেই অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইবে না, নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট আগেও না। এইরূপ সঙ্কল্পের ফলে ক্রমে অভ্যাসসিদ্ধ হইবে।

নিদ্রার পরিমাণ

সাধারণ অবস্থায় পাঁচ হইতে ছয় ঘণ্টার অধিক নিদ্রা না যাওয়াই ভাল। অতি-নিদ্রা তামসিকতার লক্ষণ। যখন দেখিবে, অত্যধিক সময় নিদ্রাসুখ অনুভব না করিলে শরীর মেজমেজে বোধ হয়, তখন জানিতে হইবে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে গাঢ় নিদ্রাই হইতেছে না। এই সময়ে নিদ্রার পরিমাণ

কমাইবার প্রকৃত উপায় হইতেছে, নিদ্রার গাঢ়ত্ব সম্পাদন করা। গাঢ়নিদ্রা হইতে আরম্ভ করিলেই অল্প সময় ঘুমাইয়াও শরীর বিন্দুমাত্র অবসাদ-গ্রস্ত হইবে না।

কি সাধক, কি কর্ম্মী, নিদ্রার পরিমাণ কমান সকলেরই পক্ষে আবশ্যকীয়। কিন্তু পরিমাণ কমাইতে গিয়া নিজ নিজ চিরাচরিত অভ্যাসের উপর জোর-জবরদস্তি করিবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রা কমাইবার একটি অত্যুৎকৃষ্ট কৌশল হইল, ধ্যান-জপে গভীর ভাবে নিবিষ্ট হওয়া। প্রত্যহ যে নিয়মিত ভাবে ধ্যান-জপাদি করে এবং ধ্যান-জপ করিতে করিতে অল্প সময়ের জন্যও যোগ-নিদ্রাভিভূত হয়, তাহার পক্ষে নিদ্রার প্রয়োজন ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ধ্যান-জপাদির নিষ্ঠাবর্দ্ধনের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই মস্তিষ্কের এমন স্বাভাবিক শীতলতা জন্মে যে, যাহার আট ঘন্টা করিয়া না ঘুমাইলে চলিত না, সেও কিছুদিন পরে পাঁচ ঘন্টা নিদ্রা দ্বারাই অটুট স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

সুনিদ্রার উপায়

রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইলে শেষ রাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া লাভ নাই কিন্তু তাই বলিয়া শেষ রাত্রিতে উঠিবার চেষ্টা ত্যাগ করিবে না। সঙ্কল্প করিবে,—যে রূপেই হউক, সুনিদ্রা হওয়াই চাই। সুনিদ্রার সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইলে, সুনিদ্রা হইবেই হইবে।

সুনিদ্রা হইবার একটি উৎকৃষ্ট উপায়, দৈহিক পরিশ্রমের প্রাচুর্য্য বর্দ্ধন করা। কঠিন কঠিন অনিদ্রা-রোগীও অনেক সময় দৈহিক ব্যায়ামের অভ্যাসের দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে।

রাত্রিতে শয়নকালে যদি ধ্যান করা যায় যে, নিঝ রিণীর সুশীতল বারিধারা যেন মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, তাহা হইলে ইহা দ্বারাও সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

অথবা যদি শয়নকালে গভীর-ধ্যান-নিবিষ্ট কোনও মহাযোগীর চাঞ্চল্যহীন মনটির কথা ভাবা যায়, তাহা হইলেও সুনিদ্রা আসে।

অথবা শয়নকালে নাভিমূলে মন স্থির করিয়া বা ইষ্টধ্যান করিয়া নাম জপ করিতে থাকিলে সুনিদ্রা জন্মে।

ত্রিসন্ধ্যা স্নানের অভ্যাস করিলে, তাহার ফলেও সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

ঔষধাদি সেবন পারত-পক্ষে উচিত নহে। তথাপি ঔষধের একান্তই আবশ্যক হইলে সকল সময়েই লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উহা যেন যথাসম্ভব গাছ-গাছড়া-ঘটিত হয়। ব্রাহ্মীর রস, অপরাজিতা পাতার রস বা সুষুণী শাকের রস নিদ্রাল্পতা রোগের মহৌষধ। দুই বেলা দুই তোলা পরিমাণ রস মিছরী সহ সেবন করিতে হয়।

ঔষধ লইয়া বাড়াবাড়ি করিবে না। ব্রমাইড বা অহিফেন-

ঘটিত ঔষধ নিদ্রাল্পতার জন্য কখনই ব্যবহার করিবে না। হাতুড়ে চিকিৎসকদিগকে যমদূতের ন্যায় ভয় করিবে এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়াই চলিতে পার, তদ্বিষয়ে অবহিত-চিত্ত থাকিবে। নিতান্ত প্রয়োজন-স্থলে বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসকের উপদেশ লইবে।

যাহাদের কোষ্ঠ অত্যন্ত কঠিন অথবা পেটের কোনও পীড়া আছে, নিদ্রার গোলযোগ তাহাদের না থাকিয়াই পারে না। এই সব স্থলে মূল দোষের সংশোধনের দ্বারা নিদ্রাল্পতা দূর করিবে।

পা, হাত, বুক না ভিজাইয়া প্রত্যহ কোমরটুকু টবের ঠাণ্ডা জলে অর্দ্ধঘণ্টা কাল ডুবাইয়া রাখিলে কামশান্তি হয়, সুনিদ্রা হয় ও পেটের রোগ কমে।

কামচিন্তা, বিশেষতঃ রাত্রিকালীন কামচিন্তা সুনিদ্রার বিষম বিঘ্ন। সুতরাং রাত্রিকালে যতটুকু সময়ই জাগা থাক বা যতবারই জাগ, সতর্ক থাকিবে, যেন কিছুতেই কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগেচ্ছা জাগরিত না হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে নাম-জপের মহিমা অসাধারণ।

কোষ্ঠ-শুদ্ধি

ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর পক্ষে কোষ্ঠ-শুদ্ধির আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। মলের তারল্য এবং কাঠিন্য উভয়ই ব্রহ্মচর্য্যের ক্ষতি-

জনক। ব্যায়ামের ফলে পাকস্থলীর শক্তি-বৃদ্ধি হইলে মলের তারল্য দূর হয় সত্য কিন্তু ব্যায়ামে সকলের মল-কাঠিন্য কমে না। তাই কোষ্ঠ-কাঠিন্য-গ্রস্তদের পক্ষে অন্য উপায়ও প্রয়োজন।

আহার কালে কয়েক গ্রাস অন্ন গ্রহণের পর একটু একটু জল পান করিলে সাধারণতঃ কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়। অবশ্য, আহার্য্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট ভাবে চর্বিত হওয়া চাই।

রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে এক গ্লাস শীতল জল পান করিলেও অনেক সময় কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়।

মুখশুদ্ধিরূপে অন্য কিছু ব্যবহার না করিয়া হরীতকী বা লবণ-মিশ্রিত হরীতকী ব্যবহার করিলেও কোষ্ঠশুদ্ধির সহায়তা হয়।

স্নানকালে নাভিমূলে প্রচুর শীতল জলধারা দিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য নিবারিত হয়।

শেষ রাত্রিতে শীতল জল পান করিলেও কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকার দর্শে। প্রত্যহ তিন বেলা আমলকী ভিজান জলও উপকারী।

মলাধার (Colon) হইতে মলকে বহির্গত করিবার জন্য কতকগুলি স্নায়ুর আকুঞ্চন আবশ্যক। ঐ সকল স্নায়ুর আকুঞ্চনের ফলে মলপথের এক প্রকার কৃমিগতি (Peristaltic Motion) উৎপন্ন হয় এবং তাহারই ফলে সঞ্চিত মল বহির্গত হয়। অসংযমের ফলে মলাধার ও মলপথ-সম্পর্কিত উল্লিখিত

স্নায়ুসমূহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে পূর্ব্বোক্ত কুন্থন উপযুক্ত-ভাবে হয় না, সুতরাং স্বাভাবিক মলবেগ বড় একটা জন্মে না। ফলে, মলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় রোগ-প্রতিকারের জন্য নিয়মিত ভাবে গুহ্যমূলে মনঃস্থৈর্য্যের অভ্যাস করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অশ্বিনীমুদ্রা, যোনিমুদ্রা বা মহাযোনি-মুদ্রার * অভ্যাস করিলে মলপথের স্নায়ুসমূহের দুর্ব্বলতা দূর হয় বলিয়া ইহাও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে গৌণভাবে উপকার করে।

মলাধারের আভ্যন্তরীণ গাত্র হইতে স্বভাবতঃই এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া মল-নির্গমের পথটীকে পিচ্ছিল ও সিক্ত করিয়া রাখে। বায়ুর রুক্ষতা প্রভৃতি কারণবশতঃ এই রসনিঃসরণ বন্ধ হইলে অথবা যথা-পরিমাণ নিঃসৃত না হইলে মল সহজে বহির্গত হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় বাধ্য হইয়া প্রবল কুন্থন দিয়া মলত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু প্রবল কুন্থনে ব্রহ্মচর্য্যের হানি ঘটিবার সম্ভাবনা। আবার জোলাপের ঔষধে মলাধারে উত্তেজনা জন্মিয়া অবশেষে অবসাদ আনিয়া থাকে। তাই, আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে শাক-পাতা ও তরি-তরকারির বরাদ্দ বাড়াইয়া দেওয়াই সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা। সুবিধা-মত কিস্‌মিস্‌, মনাক্কা, খেজুর, পেঁপে, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক ফল সেবন করা কর্ত্তব্য। মাখনতোলা

* সংযম-সাধনা— দ্বাদশ সংস্করণ, ১৩৯।১৪০।১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দই, সকাল বেলা শূন্যোদরে ইক্ষুগুড় মিশ্রিত বেলের সরবৎ অথবা উষ্ণদুগ্ধ কোষ্ঠবদ্ধে বেশী উপকারী। রাত্রিতে ঘৃতহীন আটার রুটি তরি-তরকারি বা দুগ্ধ সহ সেবন করিলেও সহজেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। অত্যধিক ঝাল ও মশলাযুক্ত খাদ্য সেবন কোষ্ঠশুদ্ধির বিঘ্নোৎপাদন করে।

কোষ্ঠশুদ্ধির দিকে সর্ব্বদাই বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, উদরাভ্যন্তরস্থ মল উপযুক্ত সময়ে বাহির হইয়া যাইতে না পারিলে এক দিকে যেমন উপদ্রব-জনক কৃমি জন্মে, অপর দিকে তেমন সঞ্চিত মলের অনিষ্টকর পদার্থ শরীরে শোষিত হইয়া প্রভূত অপকার করে।

সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, কৃমি এবং দদ্রু এই দুই রোগ ব্রহ্মচর্য্যের প্রবল শত্রু। সুতরাং এই দুই রোগের সম্ভাবনা দেখিলেই তাহার প্রতিকার-চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিদ্রোত্থিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব মল ত্যাগ করা উচিত। কারণ, মল যতক্ষণ উদর-মধ্যে অবস্থান করে, শরীরের আলস্য ও অবসাদ ততক্ষণ শত চেষ্টা করিলেও দূরীভূত হয় না। মল-নির্গম হউক আর না হউক, প্রত্যহ একই নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলস্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিলে ক্রমশঃ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়েই মলত্যাগ আপনা আপনি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া যায়।

ব্যায়াম

আলস্যের সহিত কাম-চিন্তার যেন সখাসখী সম্বন্ধ। অলস ব্যক্তির কামচিন্তা অত্যন্ত প্রবল হইবেই। এই জন্য প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রযত্নে আলস্য বর্জ্জন করা। ব্যায়ামের অভ্যাস আলস্য-বিনাশে সহায়তা করে। সর্ব্বদা মনে রাখিও আলস্যই ভারতের জাতীয় শত্রু।

দুর্ব্বলতার সহিত কামুকতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। দেহের দুর্ব্বলতা মনের দুর্বলতা সৃষ্টি করিবেই করিবে। এই-জন্যও প্রত্যেক ব্রহ্মচর্য্য-রক্ষার্থীর ব্যায়ামাভ্যাস অতীব প্রয়োজনীয়।

ব্যায়াম আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে একবার নিজের জীবনের উন্নত লক্ষ্যের কথা চিন্তা করিয়া লইবে। তাহা হইলে ব্যায়ামলব্ধ শক্তি-অপপ্রয়োগের রুচি কখনই জন্মিতেই পারিবে না। অনেক সময় দেখা যায়, লোকে ব্যায়ামের অনুশীলনের দ্বারা প্রভূত বল অর্জ্জন করিবার পর সেই বলকে অন্যায় অসৎ কার্য্যে প্রয়োজিত করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যায়ামের প্রথমে প্রত্যহ যাহারা জীবনের সুমহৎ লক্ষ্য এবং চরিত্রের গভীর পবিত্রতার বিষয় একটুকু ধ্যান করিয়া তারপরে কার্য্যারম্ভ করে, তাহাদের পক্ষে কখনও অন্যায় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য বল-বিক্রমের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। তাহাদের

বাহু অসৎ কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়, ভিতর হইতে বিবেক তীব্র কশাঘাতে অশুভ বুদ্ধিকে পরাহত করে।

ব্যায়ামকালে কোনও লালসা-বর্দ্ধক চিন্তাকে মনের কোণেও ঠাঁই দিবে না। ব্যায়াম-কালে শুধু চিন্তা করিবে, নিজের সুদৃঢ় স্বাস্থ্য লাভের কথা, বজ্রতুল্য অনমনীয় মাংসপেশীর কথা এবং নিজের বিশ্ববিঘ্ন পদাহত করিবার সামর্থ্যের কথা।

ব্যায়াম-সময়ে বাক্যালাপ, কোলাহল, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা, মনোযোগের অভাব, দৃঢ়সঙ্কল্পহীনতা অত্যন্ত দোষাবহ।

প্রাতঃস্নান

শেষ রাত্রিতে জাগরণকারীর পক্ষে প্রাতঃস্নান অতিশয় হিতকর। অভ্যাস অনুসারে রাত্রি তিনটা হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেই সময়েই উঠ না কেন, সাধারণতঃ বঙ্গদেশে প্রাতঃস্নান সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টার পূর্ব্বে হওয়া উচিত নহে। কারণ, বঙ্গদেশের বায়ুমণ্ডল পশ্চিমাঞ্চলের অপেক্ষা বহুগুণে আর্দ্র। হরিদ্বার, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে সাধু-মহাত্মারা প্রায় সকলেই রাত্রি তিনটা হইতে স্নান আরম্ভ করেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের বায়ুমণ্ডল বঙ্গদেশের মত আর্দ্র নহে বলিয়া অনিষ্টকর হয় না।

নিজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগিয়া মলমূত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক হস্ত, পদ, মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া পড়াশুনা ও ব্যায়াম সমাপনান্তে প্রাতঃস্নান করা সঙ্গত।

সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে সূর্য্যোদয়ের পর পর্য্যন্ত যতক্ষণ বায়ুমণ্ডলের প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধতা বজায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাতঃস্নান করাই অধিকতর ফলপ্রদ।

প্রাতঃকালে ব্যায়াম অভ্যাস থাকিলে ব্যায়ামের পরে স্নান এবং স্নান অভ্যাস থাকিলে স্নানের পর উপাসনা করিবে। ব্যায়ামের পরে বিশ্রাম না করিয়া স্নান করিবে না এবং স্নানের পরে উপাসনাদিতে কিছু সময় না কাটাইয়া জলযোগ করিবে না।

প্রাতে ব্যায়ামের অভ্যাস না থাকিলে প্রাতঃস্নানের পূর্ব্বে প্রাতভ্রমণ অবশ্যই করিবে। স্নানের পর ভ্রমণ বা ব্যায়াম অহিতকর, স্নানান্তে ভগবদুপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়োগ। কিন্তু উপাসনা সমাপনান্তে প্রাতভ্রমণে দোষ নাই।

উপাসনা

সঙ্কল্পের শক্তি চিত্তের পবিত্রতা রক্ষার পরম সহায়। কিন্তু যাহার আত্মবিশ্বাস যত গভীর তাহার সঙ্কল্পের শক্তিও তত অধিক। অনেক সময়ে মানুষ অবস্থার বিবর্ত্তনে আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার সংসঙ্কল্প দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে নীচ চিন্তার ক্রীড়নকে পরিণত হয়। সেই সময়ে লুপ্ত আত্ম-বিশ্বাসকে ফিরিয়া পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় উপাসনা।

উপাসনা অন্ধকারে জ্বালায় আলোক।
দূর করে অবিশ্বাস, দুঃখ, মোহ, শোক॥

নিজ নিজ রুচি-প্রকৃতির তারতম্য বুঝিয়া মানুষ স্বভাবতঃই বহুবিধ প্রকারের উপাসনা-পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার উপাসনা-পদ্ধতিরই প্রাণবস্তু হইতেছে ভগবানের নাম। নামকে কেন্দ্র করিয়া চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বতোমুখ পরিচালন দিতে পারাই যথার্থ ভাগবত জীবন।

নামের সাধনে দিলে অখণ্ড-নির্ভর,
পাষাণ ফাটিয়া পড়ে স্ফটিক-নির্ঝর।

একেবারে দ্বিধা-সংশয়-বিহীন অবিচলিত-চিত্তে নামে নির্ভর করিলে, নামকে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বাবলম্বন জানিয়া প্রাণান্ত আগ্রহে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিলে, অসম্ভবও সম্ভব হয়। নাম-সাধনের বলে অসাধ্য অনায়াসে সুসাধ্য হয়।

কিছুই অসাধ্য নাই সকলি সম্ভব,
মধুর অখণ্ড-নামে ডুবাইলে সব।

ভয়, দ্বিধা, সঙ্কোচ লইয়া সাধন করিও না, সাধনে বসিবার পূর্ব্বে সঙ্কল্পের শক্তির দ্বারা ইহাদিগকে আগে অপসারিত কর। বারংবার মনে মনে বিক্রম সহকারে বল, বিশ্বাস সহকারে বল,—"ভয় আমার নাই, দ্বিধা আমার নাই, সঙ্কোচ আমার নাই।" সাধনে বসিয়া নির্ভয়, নির্দ্বিধ, নিঃসঙ্কোচ হও। চিত্তের গোপনতম সন্দিগ্ধতাটুকুকেও সবলে এবং সমূলে উৎখাত কর।

যত ভয়, যত দ্বন্দ্ব, যত কুণ্ঠা আছে,
সব ডুবাইয়া দাও নামামৃত মাঝে।

নাম করিতে বসিবে, মরণ পণ করিয়া। এ দেহ থাকুক আর যাউক, সাধনের শেষ দেখিয়া ছাড়িব, এমন মৃত্যুঞ্জয় সঙ্কল্প চাই।

অখণ্ড অমৃতময় নামে করি' দেহক্ষয়,
জীবন সার্থক হবে, মরণেও বিশ্বজয়।

মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই, দুঃখ নাই তার তরে,
অবিরাম অনুক্ষণ নামের যে সেবা করে।

নামের একাগ্র সেবক কখনও ক্ষয়গ্রস্ত হয় না, দেহে মনে সর্ব্বত্র একমাত্র অভ্যুদয়ই তাহার প্রাপ্তি। নামের সাধনা অপ্রকাশ্য ক্ষয়স্রোতকে সঙ্গোপনে রুদ্ধ করে, প্রকাশ্য অধোগতির সম্ভাবনা হ্রাস করে। নামের ফল অমৃতময়; যে সাধনা করে, সে তাহার আস্বাদন লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হয়। সাধনা না করিয়া কেবল যুক্তির শক্তিতে নামের বল জীবনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

আস্বাদন চাহ যদি করহ সাধন,
বিনা যত্নে নাহি মিলে অমূল্য রতন।

জপ করিবে, জানিয়া। ধ্যান করিবে, বুঝিয়া। প্রণাম করিবে, ভাবের সঙ্গে যোগ রাখিয়া। জপকালের দীর্ঘতা সিদ্ধির প্রধান কারণ নহে, আত্ম-নিবেদনের গভীরতাই সিদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ।

আদর্শ ছাত্র-জীবন

জেনো তিনি তোমারি ত', তুমিও তাঁহার,
তাঁর মধুমাখা নাম দূরিবে আঁধার।
নিজেরে ঢালিয়া দিয়া চরণে তাঁহার
কর তাঁরে, হও নিজে, চির-আপনার।

উপাসনায় অকপটতা বর্জ্জন করিবে। লোক-দেখান ভড়ং-এর কোনও প্রয়োজন নাই, জনসমাজে ভক্ত বলিয়া পরিচয় লাভের কোনও আবশ্যকতা নাই। লোকমান্য সাধন-ভজনের শত্রু। প্রাণে শুধু এই আকাঙ্ক্ষারই যেন প্রদীপ জ্বলে,—

আমি, নীরবে নিভৃতে দিব জীবন বলি,
গোপনে ফুটিবে প্রেম-ফুলের কলি।

নীরবে গাহিব গান
নীরবে জাগিবে প্রাণ,
নীরব জোয়ারে বুকে পড়িবে পলি।

নীরব কাননে মম কোকিল-গীতি
জাগাইবে অতীতের মধুর স্মৃতি,
নীরবে গড়িব বেদী
সুনীল-গগন-ভেদী,
নীরবে প্রভুর পায়ে পড়িব ঢলি'।

ভগবানের নাম যখনই লইবে, তখনই উহাতে প্রাণে-মনে লগ্ন হইয়া যাইবে। নামোচ্চারণ মাত্র যেন ভগবানের বুকের

সাথে নিজের বুকের স্পর্শ অনুভব করিতে পার। নিজেকে নীচ বা নিকৃষ্ট ভাবিয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে প্রাণে এক কণাও সঙ্কোচ রাখিবে না। তাঁর বুক পাপী, তাপী সকলের আশ্রয়, তাঁর স্নেহের অধিকারী জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সকলে, তিনি সকলেরই আপন, কাহারও পর নহেন, কাহারও দূর নহেন।

আমার প্রভুর দয়া সে যে
সকল জনার চিত্তহরা,
মন-ভুলান, প্রাণ-জুড়ান,
সকল ভুবন পাগল-করা॥

পাও যদি সেই দয়ার লেশ
ভুলবে সকল দুঃখ-ক্লেশ,
ভুলবে ব্যথা, শোকের কথা,
ভুলবে মরণ, ভুলবে জরা।

পাপী ব'লে ঠেলবে নারে,
ডাকবে কাছে বারে বারে
এক পা যদি যাও পিছিয়ে
সামনে এসে দেবে ধরা;
তাই ত' তারে প্রভু বলি,
তাই ত' সে মোর জীবন-ভরা।

আদর্শ ছাত্র-জীবন

পতিত-পাবন প্রভু আমার
নিত্য-শরণ অনাথ জনার,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ আদি
তাই ত' যে তাঁর চরণ-ধরা ;
ত্রিশ কোটি দেব্‌তারা জানে
প্রভু আমার সবার সেরা।

জানিয়া লও, এমন দয়াল কেহ নাই, এমন আপন কেহ নাই, এমন নিকট কেহ নাই। জানিয়া লও, এমন মধুর কেহ নাই, এমন কোমল কেহ নাই। এমন দরদী কেহ নাই। জানিয়া লও, তাঁর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, দ্বিতীয় নাই, তুল্য নাই। জানিয়া লও, তাঁর চেয়ে উচ্চ কেহ নাই, তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তাঁর চেয়ে মহৎ কেহ নাই। তাঁহাকেই একমাত্র জানিয়া, সর্ব্বেসর্ব্বা জানিয়া, সর্ব্বেশ্বর জানিয়া, সর্ব্ববরেণ্য জানিয়া, সর্ব্বতোমহান্ জানিয়া তাঁর পবিত্র নামের যোগে চিরতরে তাঁর হও, চিরতরে তাঁকে তোমার কর।

বিশ্বাস করিও নামের বলে তোমার যাবতীয় চিত্ত-মালিন্য মুছিয়া যাইবে, পূর্ব্বকৃত যাবতীয় পাপের চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল সমুদ্র-তরঙ্গ চিরপ্রশান্তি লাভ করিবে। আজ তুমি কাঙ্গালের মত ধূলায় ধূসরিত, নামের প্রভাবে তুমি রাজরাজেশ্বর হইবে।

উপাসনা

শোক-দুঃখ যখন তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে চাহিবে, তখন নামাশ্রয়ে থাকিও। কাম, ক্রোধ যখন তোমাকে বিচলিত করিবে, তখন নামের শরণ লইও। ভয়-ভীতি যখন তোমার আত্মস্থতা নষ্ট করিতে চাহিবে, তখন নামে সাহস লাভ করিও। পরানিষ্ট-বুদ্ধি যখন তোমাকে পথচ্যুত করিবে, তখন নামের আলোকে অভ্রান্ত পথ খুঁজিয়া লইও। নামের উপর নির্ভর করিলে ভ্রমবশেও পা বেতালে পড়িবে না।

নামের সেবা করে যারা
তাদের আবার কিসের ভয়,
বেতালে তার পা পড়ে না,
যে জন সদাই নামে রয়।

কিসের হিসাব, কিসের নিকাশ,
নাম ক'রে তুই মিটারে আশ,
চল্‌তে পথে সকল মতে
নামেতে মন কর্ বিলয়।

নামের মাঝে নামীর বল,
লুকিয়ে থাকে অবিরল,
আগুনের উত্তাপের মত
দগ্ধ করে দুঃখচয়।

যোগ-যাগে যার নাই অধিকার,
নামের গুণে সব হবে তার,
বিশ্বভুবন আপন হবে,
আরাধ্য ধন সর্ব্বময়।

কিন্তু ভগবানের অমৃতময় প্রেমমধুর নামের উপরে নির্ভর করিয়া লাগিয়া থাকা সামান্য কথা নহে। ইহার জন্য সাহস চাই, ধৈর্য্য চাই, তেজস্বিতা চাই।

নামজপের নানা অবস্থা

নামজপ করিতে বসিয়া অনেক সময়ে মনকে নামে অভিনিবিষ্ট করিয়া উঠা যায় না, মন নানা অবান্তর বিষয়ে ভ্রমণ করিতে চাহে। এই সকল আবদারের পানে মোটেই দৃষ্টি দিবে না। মন নামে বসিতে চাহুক, কি না চাহুক, জোর করিয়া তাহাকে নামে লগ্ন করিতে চেষ্টা করিবে। দিনের পর দিন এই ভাবে বলপ্রয়োগ করিতে করিতে আপনিই মনের উপরে তোমার কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, ফলে সহজেই মন নামে অভিনিবিষ্ট হইবে।

মনকে নামে রুচি-সম্পন্ন ও অভিনিবিষ্ট করিবার আর এক উপায় নামের মহিমা-চিন্তন। নামের গুণে কত পাপী উদ্ধার পাইয়াছে, কত তাপী শান্তি পাইয়াছে, কত কামুক পবিত্র প্রেমের অধিকারী হইয়াছে, সেই কথা সর্ব্বদা শ্রদ্ধাসহকারে

পুলকিত অন্তরে চিন্তা করিবে। ইহার ফলে নামে চিত্তাভিনিবেশের ক্ষমতা অজ্ঞাতসারেই অপূর্ব্বভাবে বর্দ্ধিত হইবে।

ভগবানের নামের মধ্যে যাঁহারা জীবনকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের ধ্যান-প্রশান্ত সুধীর সুস্থির আনন্দময় অবস্থার কথা পরিচিন্তনেও ধীরে ধীরে নামে চিত্তাভিনিবেশের সামর্থ্য আসে।

নামে চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইল, নামের অপরিমেয় শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা। আবার, নামে অভিনিবেশ আসিলে স্বতঃই বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয়। অভিনিবেশ বিশ্বাসকে জাগায়, বিশ্বাস অভিনিবেশকে জাগায়। একটীর অধিকারী হইলে অপরটীর অধিকারী আপনি হওয়া যায়।

অবস্থা-বিশেষে সাধকের মনে নামজপ—কালে কুচিন্তাও আসে। বহুদিন পবিত্র মনে নামজপ করিবার পরে হয়ত হঠাৎ একদিন নামজপের সময়েই অতি কদর্য্য চিন্তাসমূহ মনোমধ্যে উদিত হইল। এই সময়ে ভীত বা চিন্তিত হইতে নাই। মনের গভীর প্রদেশে দৃষ্টির অগোচরে অনেক সময় প্রাক্তন পাপ-সংস্কার সযত্নে আত্মগোপন করিয়া রহে। সাধন করিতে করিতে অন্তরের দৃষ্টি যখন খুলিয়া যায়, সাধক তখন মনের সেই লুক্কায়িত কদর্য্য কামনাসমূহকে দর্শন করিয়া থাকে। এই সময়ে

এই সকল কুচিন্তাকে পূর্ব্বতন পাপের প্রাণহীন মৃতদেহ মাত্র মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে হয় এবং একাগ্রচিত্তে নামই জপিয়া যাইতে হয়। ফলে, অন্তরের প্রচ্ছন্ন আসক্তিসমূহ আপনিই একে একে প্রস্থান করে, তাহাদের পুনরাগমনেরও সম্ভাবনা থাকে না।

নামজপ করিতে করিতে অনেকের নিদ্রার ভাব আসে। এই নিদ্রার ভাব সকলের পক্ষে অহিতকারী নহে। তবে এই নিদ্রার তিনটি পৃথক্ অবস্থা আছে। একটী অবস্থা অধম, দ্বিতীয়টী মধ্যম, তৃতীয়টী উত্তম। ইহাদিগকে যথাক্রমে তামসিকী, রাজসিকী ও সাত্ত্বিকী যোগনিদ্রা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। নামজপ করিতে করিতে ঘুম আসিয়া পড়িল, নামও মনে রহিল না, শরীর আসনভ্রষ্ট বা টলটলায়মান হইল, দেহে ক্লান্তি, মস্তিষ্কে ভারবোধ, মুখে বিস্বাদুতা অনুভূত হইতে লাগিল, তন্দ্রাভঙ্গে বারংবার শয়নের ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল,—ইহা তামসিকী যোগ-নিদ্রার লক্ষণ। মনঃসন্নিবেশহীন দীর্ঘকালব্যাপী নামজপের অপেক্ষা তামসিকী যোগনিদ্রা-যুক্ত নামজপ শ্রেয়ঃ। কিন্তু নামজপকালে তামসিকী যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলে শয়ন না করিয়া কিম্বা উপাসনায় বিরত না হইয়া খুব কয়েকবার লঘু-মহামুদ্রা * অভ্যাসের দ্বারা সমগ্র আলস্য বিদূরিত করিয়া পুনরায় নামজপে

* সংযম-সাধনা দ্বাদশ সংস্করণ ১৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহার ফলে সহজেই পরবর্ত্তী উন্নত অবস্থা লাভ হয়।

নামজপ করিতে করিতে ঘুম আসিয়া পড়িল, নাম বিস্মৃত হইয়া গেল কিন্তু শরীর আসনচ্যুত হইল না, বা তন্দ্রাভঙ্গে শরীরে দারুণ ক্লান্তি, আলস্য বা শয়নেচ্ছা অনুভূত হইল না, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা নামকে পুনরুদ্বোধিত করিতে হইল,—এইরূপ অবস্থা রাজসিকী যোগনিদ্রার লক্ষণ। এই অবস্থায় তন্দ্রাভঙ্গে নিজেকে জাগ্রত বলিয়া অনুভব করা যায় কিন্তু নামজপ-কালে তন্দ্রারম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ন্যায় নামে অভিনিবেশ স্থাপনে অত্যধিক সঙ্কল্প-প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না, সামান্য সঙ্কল্পেই নাম অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে।

রাজসিকী যোগনিদ্রার ক্রমিক অভ্যাসের দ্বারা সাত্ত্বিকী যোগনিদ্রা আয়ত্ত হয়। নামজপ করিতে করিতে সহসা যেন সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইয়া সাধকের মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, সাধক জগৎ ভুলিলেন, উপাসনা-মন্দির ভুলিলেন, নিজের দেহ ভুলিলেন, ইষ্টমন্ত্র ভুলিলেন, এক অভূতপূর্ব্ব নিদ্রায় তিনি অভিভূত হইলেন। অবশ্য, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু ইহা নিদ্রা কি নিদ্রাভঙ্গ, তাহা অনুভব মাত্রও করিলেন না, চেষ্টা করিয়া তাহাকে ইষ্টনাম স্মরণও করিতে হইল না, বিনা চেষ্টায়, বিনা সঙ্কল্পে আপনা

আপনি ইষ্টনামের সাধনা জোয়ারের জলের স্রোতের মত চলিতে লাগিল এবং জলস্রোতের মধ্যে যেমন আপনা আপনিই ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গের আবির্ভাব ও বিলয় ঘটে, তেমনি প্রতিবার ইষ্টনামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অগণিত অত্যদ্ভুত অনুভূতি সমূহ আবির্ভূত ও বিলীন হইতে লাগিল। ইহা সাত্ত্বিকী যোগনিদ্রার লক্ষণ।

যখনই নামজপ করিতে বসিবে, তখনই এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিবে, "সাত্ত্বিকী যোগনিদ্রার আবির্ভাব না ঘটা পর্য্যন্ত নামজপ পরিত্যাগ করিব না।" নামজপের উদ্দেশ্য শান্তি লাভ, অতএব যতক্ষণ চিত্তের চঞ্চলতা না প্রশমিত হইতেছে, ততক্ষণ জপ ছাড়িবে না।

"হরদম লাগা রহো রে ভাই,
বনত্ বনত্ বন যাঈ।"

অর্থাৎ "প্রতি শ্বাসে-প্রশ্বাসে লাগিয়া থাক—বনিতে বনিতে বনিয়া যাইবে।" কথায় বলে—"লেগে থাকুলে মেগে খায় না।" একনিষ্ঠা বিশ্বজয়ী! কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ সাফল্যের মুল হইতেছে নিষ্ঠা বা লাগিয়া থাকা। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন পেট না ভরিতে ভাতের থালা ফেলিয়া উঠে না, নামের সেবা করিতে করিতে শান্তি, আনন্দ, তৃপ্তি এবং আত্মপ্রসাদে প্রাণ না ভরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত নাম-জপ ছাড়িবে না।

গীতাপাঠ

পবিত্র আসনে বসিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবদুদ্দেশ্যে প্রণাম-পূর্ব্বক গীতাপাঠ আরম্ভ করিবে। অঙ্গন্যাস, করন্যাস, গীতাধ্যান প্রভৃতি করিবার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই। চিত্তকে শ্রদ্ধালু, ধীর, স্থির ও একাগ্র করিবার জন্য মুদ্রিত-নয়নে কিছুক্ষণ ভগবানের নাম-জপ করাই যথেষ্ট। বৃথা কতকগুলি আড়ম্বর করা অপেক্ষা গীতা-পাঠের সম্পূর্ণ সুফল পাইবার পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্টতর উপায়। তবে অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদির দ্বারা যাঁহারা চিত্ত-স্থৈর্য্যের সহায়তা পান, তাঁহাদের পক্ষে ইহারা অনাবশ্যক নহে।

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ভগবদুপাসনা করিতে বসিয়া শান্ত-চিত্তে প্রথমতঃ গীতার একটি অধ্যায় বা সাধ্যমত কিয়দংশ পাঠ করিয়া তৎপর উপাসনা করিবে, অথবা নিয়মিত উপাসনা শেষ করিয়া গীতা পাঠ করিবে। পূর্ব্বে পাঠ করিয়া তৎপরে উপাসনা করিলে গীতা পাঠের ফলে বহির্ম্মুখগামী মন ধীরে ধীরে শান্ত হইতে থাকে এবং অল্প সময় মধ্যেই উপাসনায় গভীর নিবিষ্ট ভাব আসে। আবার উপাসনা করিবার পরে গীতা পাঠ করিলে গীতার শ্লোকের গূঢ় মর্ম্ম অতি সামান্য আয়াসের দ্বারাই উপলব্ধ হয়। যদি সাধন-ভজনের গভীরতা আকাঙ্ক্ষা কর, তবে আগে গীতা পড়িবে, পরে সাধন করিবে। যদি গীতাজ্ঞানের গভীরতা কামনা কর, তবে আগে সাধন

হইলে ভাষ্য না পড়াই উচিত। ভগবৎ-সাধনের দ্বারা আধ্যাত্মিক রাজ্যের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়, অতএব বিভিন্ন ভাষ্যের বিরুদ্ধতার স্থলে সাধনের সহায়তায় প্রকৃত অর্থের অনুসন্ধান করিবে। কাহারো ভাষ্য বুঝিতে না পারিলেই অথবা কাহারো ব্যাখ্যা তোমার মনঃপূত না হইলেই ভাষ্যকারদিগকে গালি দিবার প্রবৃত্তিও যেন আবার তোমার না হয়।

গীতা পড়িয়া লোকে জ্ঞানী হয়; আবার অজ্ঞানীও হয়। নিজের গীতা-জ্ঞান অপরের নিকট জাহির করিবার প্রবৃত্তি লইয়া গীতাপাঠ করিলে কখনো কখনো জ্ঞান-লাভ না হইয়া অজ্ঞানের অন্ধকারই পুঞ্জীভূত হয়।

অধ্যয়ন

"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ"—অধ্যয়ন ছাত্রদিগের তপস্যা। এই কথার অর্থ এই নহে যে, ছাত্রেরা দিবারাত্রি শুধু অধ্যয়নই করিবে, জীবন-গঠনের জন্য আবশ্যকীয় অপরাপর সর্ব্বপ্রকার অনুশীলন পরিহার করিয়া চিররুগ্ন গ্রন্থ-কীটেরই জীবন-যাপন করিবে। পরন্তু এই কথার অর্থ এই যে, অধ্যয়নকে কোনও রকমে পরীক্ষা-পাশেরই উপায়রূপে গ্রহণ না করিয়া ইহাকে একটা তপস্যারূপে মনঃশাসনের একটা উপায়রূপে, সংযম-সাধনার একটা পন্থারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তপস্যায় একাগ্রতা চাই, চিত্তের দৃঢ়তা চাই, অফুরন্ত

আত্মবিশ্বাস চাই ; অধ্যয়নেও এই সকল চাই। একনিষ্ঠা চাই, অপরের সহিত কথা বলিতে বলিতে, অস্থির ভাবে শরীর-চালনা করিতে করিতে, কখনো উঠিয়া, কখনো বসিয়া, কখনো চিৎ হইয়া, কখনো কাত হইয়া তপস্যা হয় না—অধ্যয়নও তদ্বৎ। তপস্বীকে বিশ্বাস রাখিতে হয় যে, তপস্যার দ্বারা তাহার স্থায়ী কল্যাণ লাভ হইতেছে, তপস্বীকে তপস্যার প্রতি সুগভীর অনুরাগ রাখিতে হয়—অধ্যয়নেও তাহা করিতে হয়, অধ্যয়নকে কখনও বেগার ঠেলার ব্যাপারে পরিণত করিলে চলিবে না।

কষ্ট করিয়া পড়াশুনা করিবে, অথচ কিছু মনে থাকিবে না, ইহা বড়ই দুঃখকর। এইজন্য প্রত্যেকেরই উচিত মস্তিষ্কের ক্ষমতা, একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের জন্য নামজপে গভীর ভাবে নিয়মিত রূপে আত্মসমর্পণ করার অভ্যাস করা। নাম-সেবা মস্তিষ্কের স্থিরতা, চিত্তের সুস্থতা, চক্ষুর স্নিগ্ধতা এবং বুদ্ধির প্রসন্নতা সম্পাদন করে। কিন্তু এই সহজ সত্য উপেক্ষা করিয়া আজকাল ছাত্র-সমাজ ভাইনাম্ গ্যালেসিয়া এবং ডিম্ব সেবনের দ্বারা স্মৃতি, মেধা ও বুদ্ধির অভাব পূরণ করিতে চাহে। কি দুর্দ্দৈব ! আর, কি নির্ব্বুদ্ধিতা !

পাঠারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্থিরাসনে বসিয়া প্রথমতঃ নিজেকে নিজের প্রভু বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে। তৎপর নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার বলিতে থাকিবে—"এই

মুহূর্ত্ত হইতে আমার স্মৃতিশক্তি দিনের পর দিন উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিবে, আমার ধারণা-শক্তি, আমার বুঝিবার সামর্থ্য স্পষ্টতর হইতে থাকিবে, সুন্দরতর হইতে থাকিবে, চেষ্টা করিয়া আমাকে কিছু মনে রাখিতে হইবে না, আপনা আপনি সব মনে থাকিয়া যাইবে এবং এমন ভাবে মনে থাকিবে যে, প্রয়োজনের সময়ে কষ্ট করিয়া তাহা স্মৃতিতে জাগাইতে হইবে না, স্বভাবতঃ সে জাগিবে, নির্ভুল ভাবে সে জাগিবে, স্মৃতি-শক্তিকে বাড়াইবার জন্য আমি কোনও চেষ্টা না করিলেও দিনের পর দিন সে বাড়িতেই থাকিবে।"—এই সময়ে কল্পনার বলে অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে যেন, সত্য সত্যই তোমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ সহস্রদল পদ্মের নিমীলিত পাপড়ীগুলি সাহ্লাদে, সোল্লাসে খুলিয়া যাইতেছে এবং তোমার মস্তিষ্কের ধারণা-শক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রতিদিনই অনুভব করিতে চেষ্টা করিবে যেন, তোমার এই স্মৃতিশক্তি দিনের পর দিন অতি দ্রুত গতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং এই শক্তি তোমার মস্তিষ্কে একেবারে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা নিতান্ত দুর্ম্মেধা বিদ্যার্থীও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু চাই অকপট বিশ্বাস এবং অধ্যবসায়। বিশ্বাস হারাইও না, উদ্যম ছাড়িও না।

ধরে আর ছাড়ে;
প্রতি যুদ্ধে হারে।

কুসঙ্গ ও বাক্-সংযম

ছাত্রগণের কুসঙ্গ-সংগ্রহের দুইটি প্রধান ক্ষেত্র হইতেছে, খেলার মাঠ আর বিদ্যালয়। আর একটি স্থান হইতেছে, যেখানে বহু পরিবার একত্রিত হইয়া ঘন ঘন বসতিতে বাস করে। এই তিনটি ক্ষেত্রেই কুসঙ্গ-নিগ্রহের প্রথম উপায় বাক্-সংযম।

খেলাধূলা স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের পক্ষে আবশ্যক, বিশেষতঃ ইহা দ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা সঞ্চিত হয়। কিন্তু যে স্থলে খেলাধূলা শেষে গিয়া আড্ডা মারার ব্যাপারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা, যেখানে কুচর্চ্চা, কদালাপ খেলাধূলার সঙ্গী হইবার সম্ভাবনা, সেখানে খেলাধূলা বর্জ্জন করিয়া শুধু ব্যায়ামের দ্বারাই শরীর-স্বাস্থ্য বজায় রাখা উচিত।

বিদ্যালয়ের বন্ধুতা অনেক সময় গলাগলি, কোলাকুলি হইতে অতীব কদর্য্য ব্যাপারে পরিণত হয়। প্রতিদিন একই জনের নিকট বসা অনেক সময় ঘোর তামসিকতার প্রশ্রয় দেয়। এই জন্য নিয়ম করিবে, বহু ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিবে না এবং যাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার মধ্যে কোন অনৈতিকতার সম্ভাবনা দেখিলে বিষধর ভুজঙ্গজ্ঞানে তাহাকে বর্জ্জন করিবে। চরিত্র-রক্ষার্থীর পক্ষে দুর্ব্বলতা বা চক্ষুলজ্জা বিষম অনিষ্টকর।

কেহ তোমার সহিত অসদুদ্দেশ্য লইয়া মিশিতে চাহিতেছে বুঝিলে বাক্য বন্ধ করিয়া তাহার বন্ধুত্বের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে। কাহারও বন্ধুত্ব প্রবল আবেগ লইয়া প্রকাশিত হইতেছে দেখিলে, বাক্য-সংযমের দ্বারা তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতাকে সংযত করিবে। মনে রাখিবে, তরুণ ও অসাধক চিত্তের আবেগ অধিকাংশ সময়েই প্রচুর আবিলতা বহন করিয়া চলে।

এক পাড়াতে বাস করিতেছ বলিয়াই যে, সকল বালক-বালিকাদের সহিত বাক্যালাপ করিবে, তাহা নহে। যাহার নিকট প্রয়োজন নাই, তাহার সহিত নিজে সাধিয়া ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিবে না কিম্বা তাহাকে তোমার সহিত ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করিতে দিবে না। একদিন কাহারও সহিত প্রয়োজন-বশে বাক্যালাপ করিয়াছ বলিয়া প্রতিদিন করিতে হইবে, তাহাও নহে।

যাহাদিগকে চরিত্রহীন বলিয়া জান, খুন করিয়া ফেলিলেও তাহাদের সহিত বাক্যের বা ব্যবহারের সম্পর্ক রাখিবে না। সদুদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াও যদি তাহারা কাছে আসে, দূরে সরিয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিও। খলকে বিশ্বাস নাই।

শব্দ এক মহতী শক্তি। চিত্ত প্রশান্ত হইলে এক একটি শব্দ এক একটি মন্ত্রে পরিণত হয়, এক একটি ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হইয়া যায়। এই বস্তুর অপব্যয় করা যায় না, যার তার সঙ্গে ইহার বিনিময় অকর্ত্তব্য।

বাক্-সংযমে মনের শক্তি বাড়ে, সঙ্কল্পের বল বাড়ে, তেজ বাড়ে। অপরে যখন কাকাতুয়ার মত অর্থহীন, লক্ষ্যহীন প্রলাপ বকিয়া শক্তির অপচয় করিতেছে, তুমি সেই সময়ে শক্তিকে সঞ্চয় কর, মৌনের দ্বারা সংযম-সামর্থ্য বর্দ্ধিত কর, বিশ্বনাথের অখণ্ড-প্রাণের সহিত স্বকীয় প্রাণের যোগ-সাধনের দ্বারা দ্রুত-গতিতে সমৃদ্ধি লাভ কর।

দিনের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুবিধামত এক ঘণ্টা কি দুই ঘণ্টা অথবা সপ্তাহের মধ্যে কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট দিন বা দিনের অংশ মৌনী থাকিবার অভ্যাসের দ্বারা বাক্-সংযমের ক্ষমতা বাড়ে।

ভগবৎ-সাধনের নিবিষ্টতায়ও বাক্ সংযমের সামর্থ্য বাড়ে। কত বাচাল যে জগতে শুধু নাম-জপের শক্তিতে ধীর, স্থির ও শান্ত-ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আহার

সহজপাচ্য, সহজপ্রাপ্য, পুষ্টিকর দ্রব্য পবিত্র ভাবে রন্ধন করিয়া নিবেদন করিয়া আহার করিবে। গোজাতির যত্ন ছাড়িয়া আমরা নিজেরাই গোজাতিতে পরিণত হইয়াছি, আমাদের এক্ষণে খাদ্যের বাছাবাছি করিয়া হট্টগোল সৃষ্টি করা বৃথা। যে খাদ্য সহজে জীর্ণ হয়, শরীর যাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই যথাসাধ্য কম মশলা দিয়া রাঁধিয়া খাইবে এবং পাঁচবার ভগবানের পরমানন্দময় নাম স্মরণ-

পূর্ব্বক "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি", আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি, এই সঙ্কল্প-পূর্ব্বক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া প্রতি গ্রাস অন্ন গ্রহণকালে বত্রিশ বার চর্ব্বণ করিয়া ইষ্টনাম স্মরণ করিবে।

দিবানিদ্রা

"মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবানিদ্রা বর্জ্জনীয়। কারণ, দিবাভাগে নিদ্রা গেলে রাত্রিতে ঘুম পাতলা হয়, তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের হানি ঘটিতে পারে। যাহাতে রাত্রের ঘুম পাতলা না হইতে পারে, তার দিকে লক্ষ্য দিয়াই সকল দৈনন্দিন কার্য্য-পরিচালনা কর্ত্তব্য।

দিবানিদ্রা আলস্যের জনক, বহুবিধ রোগেরও জনক। অতএব কামেরও জনক। ইহা সযত্নে পরিহর্ত্তব্য।

দিবানিদ্রা দ্বারা সময়ের অপব্যয় হয়। অতএব ইহা কর্ম্মীর কর্ম্মনাশক।

একদিন দিবাভাগে নিদ্রিত হইলে পরের দিনও নিদ্রিত হইতে ইচ্ছা যায়। অতএব ইহা কদভ্যাস-কারক।

দিবাভাগে নিদ্রার উপক্রম হইলে শ্রমজনক-কার্য্যে অথবা ধর্ম্মমূলক বা জাতীয়ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিবে। চরকা কাটা দিবানিদ্রার উত্তম ঔষধ।

দিবানিদ্রার অভ্যাস ত্যাগের উপায় ঃ—

মাধ্যাহ্নিক স্নানের পরে একটু দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়াই নিমীলিতনেত্রে নামজপ করিবে। নাম-জপের ফলে

নিদ্রাতুরতা আসিলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিদ্রার আলস্য দেহ হইতে আপনি অপগত হইয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নামজপ চালাইতে থাকিবে। তৎপরে আহারাদি করিবে। দিন কয়েক এইরূপ অভ্যাস করিলেই দেখিতে পাইবে যে. দ্বিপ্রহরে আর চক্ষু নিদ্রায় ঢুলু ঢুলু করে না, শরীরও অলস বা অবসাদগ্রস্ত হয় না।

অঙ্গস্পর্শ

কাহারও শরীর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্পর্শ করা ব্রহ্মচর্য্য পালনার্থীর পক্ষে অনুচিত। কারণ,—

১। অঙ্গস্পর্শ হইতেই অধিকাংশ সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

২। অত্যন্ত কামুক বা নীচবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির স্পর্শে অজ্ঞাতসারে স্পর্শকারীর মনোমধ্যে কাম ও নীচ-বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া থাকে।

৩। আমোদ—প্রমোদ, খেলা-ধূলা, আদর-আপ্যায়ন বা স্নেহ ভালবাসার ছলে পরস্পরের অঙ্গস্পর্শ করিতে গিয়া অনেক সময়ে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন অসংযমকেই তৃপ্তি দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে ।

কাহাকেও কোলে লওয়া বা কাহারও কোলে বসা, কাহারও সহিত জড়াজড়ি করিয়া অবস্থান করা, গলাগলি-ঢলাঢলি করা

প্রভৃতি অধিকাংশ সময়েই সংযম-সামর্থ্য নাশ করে। অতএব এই সকল যত্নতঃ বর্জ্জন করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া, একেবারে শুচি-বায়ুগ্রস্ত হইলেও চলিবে না। নিজের ছোট ছোট ভাই-বোনকে কোলে লইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবে, এমন সব কল্পনা একেবারে অশ্রদ্ধেয় জানিও।

লোক-স্পর্শ-বর্জ্জনের চেষ্টা সত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃত স্পর্শ ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে নিজের মধ্যে পরম পবিত্রতার অনন্ত আধার পরব্রহ্মের নিত্যস্থিতির কথা ধ্যান করিয়া নিজেকে অপাপবিদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা পাইবে।

কাহারও অঙ্গস্পর্শে যদি চিত্ত-মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, তবে তাহার অঙ্গকে ভগবানের অঙ্গ, অতএব পবিত্রতার আধার-স্বরূপ বলিয়া পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে চেষ্টা পাইবে।

দৈবক্রমে একবার কাহারও অঙ্গস্পর্শ ঘটিয়া গেলে যদি লক্ষ্য কর যে, পুনরায় তাহাকে স্পর্শ করিবার জন্য মনে ব্যাকুলতা আসিতেছে, তাহা হইলে অধিকাংশ সময়েই ইহাকে আসক্তি বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং আসক্তি দমনের জন্য যথাসাধ্য যত্ন পাইতে হইবে। আসক্তি দমনের উপায় নিজেকে পূর্ণ বলিয়া অনুভব করা অথবা পূর্ণতা-স্বরূপ শ্রীভগবানের সহিত মনে প্রাণে যুক্ত হওয়া।

অরণ্যে গিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়া মনুষ্য-সমাজেই বাস করিতে হইলে দিনের মধ্যে শতবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও

অপরের শরীর স্পৃষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে, বিশেষতঃ কর্ম্ম-জীবনে । এমতাবস্থায় ব্রহ্মচারীর পক্ষে শারীরিক ও মানসিক কর্ত্তব্য আছে । তাহা এই—

(ক) আপাদমস্তক শরীরের সর্ব্বস্থানে উত্তমরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে এবং কোনও কারণে কখনও শরীরে ক্ষতাদি উৎপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ঔষধাদির দ্বারা নির্ম্মূল করিবে। কারণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতের মধ্য দিয়াই অধিকাংশ সময়ে অপরের দেহের দুরারোগ্য রোগের বীজাণুসমূহ নিজ শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং যে শরীরে উত্তম রূপে তৈল মর্দ্দিত হয়, সেই শরীরে বাহিরের বীজাণু সহজে প্রবেশ করিতে বা বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

(খ) মনে মনে নিজেকে সর্ব্বদা ভগবানের নামের বর্ম্মে আচ্ছাদিত বলিয়া চিন্তা করিবে। বর্ম্মাচ্ছাদিত ব্যক্তির দেহে যেমন শত্রু-নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয় না, ভগবানের নামের আচ্ছাদনে সুপরিরক্ষিত দেহেও তেমন অপরের স্পর্শ-হেতু কুভাব কুপ্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না—নিয়ত এইরূপ ভাবনা করিবে।

(গ) দেহের বিভিন্ন অঙ্গে মনকে সঞ্চালিত করিয়া সর্ব্বদা ভাবিতে থাকিবে "ওঁ জগন্মঙ্গলোঽহং ভবামি"—"আমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি" * প্রতিমুহূর্ত্তে যে নিজেকে

* সংযম-সাধনা দ্বাদশ সংস্করণ ৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

জগতের কল্যাণকারী-রূপে গঠনের সঙ্কল্পই করিতে থাকে, কাহারও পাপচিন্তাই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

দৃষ্টি-সংযম

গুহ্য-অঙ্গ নিরীক্ষণ ব্যাপারটী বড়ই লালসা-বর্দ্ধক। যাহার মুখ-চোখ দেখিয়া বা যাহার সহিত কথোপকথন করিয়া কখনও কামোদ্রেক হয় না, তাহার শরীরের গুপ্ত-স্থান নিরীক্ষণ করিলে চিত্তমধ্যে সহসা পাপ-বুদ্ধি জাগিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেরই গুহ্য-স্থান দর্শনে সর্ব্বদা বিরত থাকিবে।

অল্প-বয়স্ক শিশু দেখিলে, শিশুটী পুরুষ কি স্ত্রী, তাহা জানিবার জন্য কখনও কৌতূহলী হইবে না,—শিশুকে শিশু বলিয়াই জান, দেব-স্বভাব বলিয়াই জান, ভগবানের রূপ বলিয়াই দর্শন কর, ইহার অতিরিক্ত জানিবার তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, উলঙ্গ শিশুর পুংস্ত্ব বা স্ত্রীত্ব নির্ণয় করিবার আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে জাগ্রত হওয়া মাত্রই তোমার দৃষ্টিও সংযত করা আবশ্যক। পরিচ্ছদের নীচে কাহার শরীর কিরূপ, সেই বিষয়ে কোনও কল্পনাকে কখনও মনোমধ্যে জাগ্রত হইতে দিবে না।

কেহ বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতে থাকিলে সেই সময়ে তাহার দিকে তাকাইবে না, যেহেতু ইহাতে তোমার কুদৃশ্য দর্শনের সম্ভাবনা আছে। স্ত্রীলোকেরা যে ঘাটে স্নানাদি করেন, সেই

ঘাটের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। স্ত্রীলোকেরা যেখানে বিশ্রব্ধভাবে অবস্থান করেন বা নিদ্রিত থাকেন, সেখানে যাইবে না।

ডাক্তারী পুস্তকসমূহে নারী ও পুরুষের জননেন্দ্রিয়ের যে সকল ছবি আছে, চিকিৎসা-শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহারা চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে না, এমন ব্রহ্মচারীদের পক্ষে ভ্রমেও ঐ সকল ছবি দেখা সঙ্গত নহে। কেননা, অনেক সময়ে একখানা ছবি দেখিয়া ব্রহ্মচারীকে যতখানি দৈহিক ক্ষতি ও মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিতে হয়, গৃহীরা ইতর সুখ-সম্ভোগ করিয়াও ততখানি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিব্রত হন না।

চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থী ব্রহ্মচারীর পক্ষে নির্ভয়ে সকল অবস্থার সম্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞানলাভের জন্য এবং লোক-হিতার্থে সবই করিতে হইবে, কিন্তু নিজের মধ্যে এবং সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের নিত্য অবস্থিতির স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিয়া।

হাটে বাজারে আজকাল অশ্লীল ছবির ছড়াছড়ি। বৈতরণীর পারে দাঁড়াইয়াও অনেক পত্রিকা-সম্পাদক তামসিক প্রকৃতির গ্রাহক-গ্রাহিকার মনোরঞ্জনের জন্য লালসাবর্দ্ধক জঘন্য ছবি প্রচার করিতেছেন। সুকুমার শিল্পের নাম দিয়া অনেক চিত্রকর লজ্জার মাথা খাইয়া উলঙ্গ নারী-মূর্ত্তি বাজারে বিকাইতেছেন। সজীব নারীবিগ্রহও লুপ্ত নৃত্যকলার

পুনরুদ্ধারের প্রয়াসরূপে প্রায় প্রতি বিদ্যায়তনের বার্ষিক উৎসবে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেছে। চক্ষুকে এই সকল অপবিত্র দৃশ্য হইতে বাঁচাইয়া চলিবে।

যে সকল পথ-ঘাটে বারনারীরা নিজেদের হাবভাবময়ী মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে বা চলাচল করে, সে সকল পথে কখনও চলিবে না।

গৃহ-মধ্যে কখনও এমন একখানা ছবিকে ঢুকিতে দিবে না, যাহা দর্শনমাত্র চিত্ত পবিত্রতার অমৃতময় রসে সিক্ত না হয়।

মৃতদেহ দেখিলেও তাহার গুপ্ত অঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করিবে না। অধিক কি, নিজের গুপ্ত অঙ্গের প্রতিও কখনও নিষ্প্রয়োজনে তাকাইবে না এবং যদি কখনও তাকাইবার আবশ্যকতা হয়, তাহা হইলে "আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি জিতকাম" এইরূপ সঙ্কল্প করিতে থাকিবে।

কখনও অনিচ্ছাক্রমে মানুষ বা জীব-জন্তুর গুপ্ত স্থানে দৃষ্টি পড়িলে তৎক্ষণাৎ প্রদীপ্ত সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া দৃষ্টিকে সংশোধিত করিবে এবং মনকে অপবিত্রতা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি দিয়া শ্বাসে ও প্রশ্বাসে ভগবানের নাম করিতে থাকিবে।

বর্জ্জন করিবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কুদৃশ্য চক্ষে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়া কর্ত্তব্য নহে। নিজেকে ভগবানের দাস জানিয়া, অমৃতের সন্তান

জানিয়া নির্ভীকতা রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য-সাধনা কাপুরুষের সাধনা নহে, ইহা বীরের সাধনা, ভয়হীনের সাধনা। তপস্যা দুর্ব্বলের চিত্তবিনোদনের জন্য টেবিল সাজাইবার কৃত্রিম কাগজের ফুল নহে—তপস্যায় সাহস ও সবলতার প্রয়োজন আছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে কায়মনোবাক্যে পবিত্র থাকিবে। স্ত্রীজাতি-সম্পর্কে এমন কোনও কায়িক ব্যবহার, মানসিক চিন্তা বা বাক্য-প্রয়োগ করিবে না,—

১। যাহা দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি তোমার কখনো কোনও প্রকার অপবিত্র মনোভাবের উত্তেজনা হইতে পারে।

২। যাহা দ্বারা স্ত্রীজাতির মনোমধ্যে তোমার বা অপর কাহারও প্রতি অপবিত্র মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে।

৩। যাহা দ্বারা স্ত্রীজাতির প্রতি অপর কাহারও অপবিত্র মনোভাব জন্মিতে পারে।

স্ত্রীলোক-নিন্দনে এবং নিন্দা-শ্রবণে বিরত হইও, নারী-জাতিকে মাতার জাতি বলিয়া, ভগ্নীর জাতি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে চেষ্টা করিও, স্ত্রীলোকের মুখের পানে দৃষ্টি পড়িলে নিজের মায়ের মুখখানাকে কল্পনার নেত্রে দর্শন করিয়া ভক্তি-বিনম্র চিত্তে মনে মনে প্রণাম করিও।

স্ত্রীজাতির যাহারা দোষ অন্বেষণ করে, তাহাদের সংযম-সামর্থ্য নষ্ট হয়, ব্রহ্মচর্য্য ধূলায় লুটায়।

যুবকদের মধ্যে এমন মূর্খ অনেকেই আছে, যাহারা স্ত্রীলোকের সম্পর্কে অপবাদ শুনিতে প্রীতিবোধ করে। মূর্খাধম এমন যুবকও আছে, যাহারা অপবাদগ্রস্তা স্ত্রীলোকের চরিত্র ভাল কি মন্দ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এই সব হতভাগ্যেরা নিজেদের রচিত কূপে নিজেরা পতিত হয় এবং পরের চরিত্র খুঁজিতে যাইয়া নিজেদের সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকের মুখে পাপের ছাপ খুঁজিয়া বেড়াইও না, স্ত্রীলোকের চোখে লালসার বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিতে যাইও না,—যার দিকেই চোখ পড়ুক, জগজ্জননীর কামগন্ধহীন জগৎপালনী মহামূর্ত্তিই দেখিতে চাহিও। বারনারীর প্রতি দৃষ্টি পড়িলেও তাহার জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে একবারের তরেও চিন্তা পরিচালনা করিও না, তার ভিতরেও যে আদ্যাশক্তি মহেশ্বরী বিরাজ করিতেছেন, ভূয়োভূয়ঃ তাহাই স্মরণ করিয়া ভগবদ্‌-ভক্তিতে রোমাঞ্চিত-তনু হইও। শ্রদ্ধা-ভক্তিই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত বন্ধু; নিন্দা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ নহে।

ইচ্ছা করিয়া স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে না, আবার প্রয়োজন স্থলে তাহাদের সম্মুখীন হইতে হইলে বুকভরা আশঙ্কা, আতঙ্ক ও ভয় লইয়াও অগ্রসর হইবে না। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক পবিত্রতায় গভীর শ্রদ্ধা এবং নিজের সংযম-শক্তিতে

অটুট-বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইবে।—কোনও স্ত্রীলোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে আসিলে স্থান-ত্যাগ দ্বারা বা অপর কোনও কৌশলে সেই ঘনিষ্ঠতার অবসান ঘটাইবে। স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা করিবার শক্তি তোমার যেরূপ থাকা আবশ্যক, আবার প্রয়োজনমাত্র স্ত্রীলোকের সকল সংশ্রবের বাহিরে নিজেকে নির্ম্মমভাবে টানিয়া লইয়া যাইবার শক্তি থাকাও তেমন আবশ্যক।

কামনা- ফাঁসির দড়ি, আদর করি'
পরিস্ না রে, পরিস্ না রে।
কামিনীর মোহনরূপে মোহের কূপে,
পড়িস্ না রে, পড়িস্ না রে।

স্বপনের সুখের লোভে, খানায় ডুবে,
পূতিগন্ধে মরিস্ না রে।
ওরে তুই, প্রেমের ছলে, বুঝার ভুলে,
কামের নেশা করিস্ না রে।

খুঁজে তোর, আপন জনে, গোপন মনে,
নারীর সঙ্গ করিস্ না রে।
নারী তোর, মায়ের ছবি, বুঝলে পাবি,
প্রাণের জনে প্রাণ-মাঝারে।

কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুভাব আসিলে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক

হইবে এবং এই ভাব আর কখনও মনোমধ্যে উঁকি মারিতেও পারিবে না বলিয়া দৃঢ়তার সহিত "প্রবেশ নিষেধ" জ্ঞাপন করিতে থাকিবে। একটা সৎ-সঙ্কল্পের কথা মনে মনে বারংবার দৃঢ়রূপে উচ্চারণ করিতে করিতে প্রকৃতই দুষ্টচিন্তার প্রবেশ-পথ স্বতঃ রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহা সহস্র সহস্র ক্ষেত্রে সুপরীক্ষিত মহাসত্য।

ভবিষ্যৎ ভারতে নারীজাতির মধ্য হইতে বুদ্ধ, শঙ্কর চৈতন্যের সমকক্ষ কত কত মহীয়সী-মহিলার যে আবির্ভাব হইবে, ভগবৎ-সাধনার সহিত স্বদেশ-সাধনার সামঞ্জস্য-বিধায়িকা, শত শত অলস-অকর্ম্মণ্যের মধ্যে নিরলস কর্ম্মিষ্ঠ-তার প্রবর্ত্তিকা এবং ইন্দ্রিয়-সুখ-তন্দ্রিত মোহাচ্ছন্ন অসংখ্য নরনারীর প্রাণ-মন্দিরে মনুষ্যত্বের জাগ্রত দেবতার শৌর্য্যময় সিংহাসনের প্রতিষ্ঠাত্রী শত শত মহামানবী যে এই স্ত্রীজাতির মধ্য হইতে আত্মপ্রকাশ করিবেন,—সেই চিন্তার প্রগাঢ়তা তোমার অন্তরে ভাব-ঘন শ্রদ্ধার সঞ্জনন ঘটাইবে, তোমাকে নীচ, পঙ্কিল কলুষিত চিত্তবিকারের নিদারুণ কবল হইতে রক্ষা করিবে। ভাবিতে থাক—

আসিবে সেদিন আসিবে,
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে।

স্ত্রীজাতির প্রতি

কত মহীয়সী মহিলার দল
পুরুষ-জাতিরে বিতরিবে বল,
ভগবৎ-প্রেম-অমিয়ে সবারে
ভাসাবে, নিজেরা ভাসিবে।

লালসা, কলুষ, নীচতা, হীনতা,
সকলি করিবে দূরিত,
উন্নত-শির মানব জাতিতে
জগৎ করিবে পূরিত,
নব-সৃজনের হরষে সবারে
হাসাবে, নিজেরা হাসিবে।

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান-গরিমায়
দিবে এ ধরণী ভরিয়া,
অতীতের শত ধ্বংসের মাঝে
নূতন পৃথিবী গড়িয়া,
যাহা কিছু আছে মঙ্গলহীন,
বাষ্পরাশিতে ক'রে দেবে লীন,
অশিব অদেব অসুন্দরেরে
চরণের ভারে ত্রাসিবে।

জীর্ণ করিয়া মৃত্যু-গরল
অমৃতের হবে জননী,
বিশ্ব জুড়িয়া সন্তানদের
অমৃতে পূরিবে ধমনী,
চির-অনাময় করিয়া জীবন
আনন্দময় করিবে মরণ,
পতন-বিহীন মোহ-বিনাশন
স্নেহ দিয়া ভালবাসিবে।

কৌপীন পরিধান

কৌপীন পরিধান * ব্রহ্মচর্য্যের সহায়ক। কিন্তু কৌপীন কোমরে জড়াইলেই কি হইল ? তাহা নহে। কৌপীন-বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সংসঙ্কল্পকে দৃঢ় করিতে হয়, তবে গিয়া কৌপীন পরার সার্থকতা। ঢং দেখাইবার জন্য কৌপীনের অমর্য্যাদা করিবার অধিকার তোমার নাই,—এই কথা স্মরণে রাখা একান্ত আবশ্যক।

কৌপীন পরিধান-কালে স্থিরচিত্তে সঙ্কল্প করিবে—

১। কৌপীন-পরিধান আমার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির জন্য, সখের জন্য নহে।

---

* কৌপীন এবং লেঙ্গট ব্যবহারের গুণাগুণ এক। সরল ব্রহ্মচর্য্য দ্বাদশ সংস্করণ ৭০ পৃষ্ঠা ও সংযম-সাধনা দ্বাদশ সংস্করণ, ১৫১।১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গ্রাম-অঞ্চলে অনেকেই সমবেত ভাবে কীর্ত্তনে বসিতে হইলে আগে আহারাদির কার্য্য সমাপন করিয়া আসেন, তারপরে যতক্ষণ সামর্থ্যে কুলায় হরিনাম গান করেন। এই সব স্থলে ব্রহ্মচর্য্য-পালনার্থীর পক্ষে অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধি এই যে, নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তি-সহকারে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হইলে কীর্ত্তন-পদের সুমধুর ভাবটুকু হৃদয়ে ধারণ করিয়া নাম জপ করিতে করিতে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিবে। ভগবান্ ভাবগ্রাহী, নর্ত্তন-কুর্দ্দন কিছু কম হইল বলিয়াই যে তিনি তাঁহার কৃপাহস্ত সঙ্কুচিত করিবেন, এমন নহে।

কখনও একান্তই ঠেকা বশতঃ রাত্রি-জাগরণ করিতে হইলে তৎপর দিন প্রাতঃকালে সর্ব্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট ভাবে সর্ষপ-তৈল মর্দ্দন করিয়া অধিক বেলা না হইবার পূর্ব্বেই উত্তমরূপে স্নান করিবে এবং স্নানানন্তর সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নাম জপের ফলে যে নিদ্রাবেশ হইবে, তাহা সাধারণ নিদ্রা অপেক্ষা রাত্রি জাগরণের কুফল নিবারণে অধিকতর ফলপ্রদ। কদাচ সুপ্তিস্খলনাদি হইলেও স্নানধ্যানাদি সম্বন্ধে এই নিয়মই পালনীয়।

কদাচিৎ নিদ্রা-বিকারাদি হইলে তাহার জন্য একেবারে মন-মরা হইয়া যাইবে না। যাহা হইয়া গিয়াছে, গিয়াছে। সঙ্কল্প করিবে, ইহার পর যেন তুমি নিরুপদ্রব হইতে পার।

নিদ্রাকালীন কদভ্যাস ★

চরিত্রের একান্ত দুর্ব্বলতা যাহাদের মধ্যে, তাহাদের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিতে গেলেই যত তামসিক-ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া পড়ে, কেহ কেহ নিদ্রাবস্থায়ই হস্তক্রিয়া দ্বারা বীর্য্যক্ষয়কর কদাচারে আসক্ত হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলি প্রাণপণ যত্ন সহকারে পালন করা। যথা—

(১) শয়নের পূর্ব্বে সরল মেরুদণ্ডে শয্যায় বসিয়া একবিংশ বার অশ্বিনীমুদ্রা বা যোনিমুদ্রা করতঃ জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প পূর্ব্বক পরিভ্রমণ অভ্যাস করিবে। তৎপর অবিশ্রান্ত নামজপ করিতে থাকিবে এবং নামজপ করিতে করিতে যতক্ষণ না নিজেই নিজের অজ্ঞাতসারে শয্যায় ঢলিয়া পড়িতেছ, ততক্ষণ সজোরে জপ চালাইতে থাকিবে। মোটকথা, জাগ্রত অবস্থায় কিছুতেই শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া দিবে না— এক্ষণে তার জন্য যতই কষ্ট বা অসুবিধা হউক না কেন।

---

* এই প্রসঙ্গটা পুস্তকে দিবার গ্রন্থকারের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নিদ্রাকালীন কদভ্যাসের বশবর্ত্তী অসংখ্য যুবক আত্মরক্ষার উপায় জানিবার জন্য সর্ব্বদা এত পত্র লিখিয়া থাকেন যে, প্রত্যেককে পৃথক্ উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া গ্রন্থ-মধ্যেই মুদ্রিত হইল।

† সংযম সাধনা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৩৯।১৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) রাত্রিতে সহসা কখনও নিদ্রাভঙ্গ হইলে শয্যায় শয়নাবস্থায় তখনই মেরুদণ্ড সরল করিয়া উঠিয়া বসিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরায় গভীর নিদ্রায় অবশ হইয়া ঘুমাইয়া না পড়, ততক্ষণ নাম জপ করিতেই থাকিবে।

(৩) সমগ্র দিবস যাহাতে কঠোর দৈহিক শ্রমমূলক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পার, তার দিকে লক্ষ্য রাখিবে, এবং অনিদ্রা, অল্পনিদ্রা, অপূর্ণনিদ্রা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রয়োজন মত মস্তিষ্কের শীতলতা-সম্পাদক গাছ-গাছড়ার পাতার রস (যথা,—অপরাজিতা পাতার রস, ব্রাহ্মীর রস, ভৃঙ্গরাজের রস) ব্যবহার করিবে এবং সহ্য হইলে তিনবেলা স্নান করিবে।

(৪) যতদিন পর্য্যন্ত নিদ্রাবস্থায় এইরূপ আত্মঅপচয়ের কদভ্যাস সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে শক্ত করিয়া কৌপীন-বন্ধন আঁটিয়া পরিবে এবং কৌপীন পরিধানকালে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া মনে গভীর আত্মবিশ্বাস রাখিয়া দৃঢ়তা-সহকারে প্রতিজ্ঞা করিতে থাকিবে যে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইলেও কামেচ্ছার তৃপ্তি সাধনের জন্য কখনও কৌপীন-বন্ধন শিথিল ও উন্মোচিত করিবে না। † এইরূপ সঙ্কল্প অন্ততঃ

---

† সংযম-সাধনা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৫১।১৫২।১৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দশ মিনিটকাল করিবে এবং তৎপরে মুদ্রাভ্যাস ও নামজপে নিরত হইবে।

(৫) দিবাভাগে বা রাত্রিতে নিজের হাতের দিকে যখনই দৃষ্টি পড়িবে, তখনই বারংবার মনে মনে সঙ্কল্প করিবে,—"কামেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া এই হস্ত কখনও পরিচালিত হইবে না, অজ্ঞাতসারেও কখনও এই হস্ত জননেন্দ্রিয়কে স্পর্শমাত্র করিবে না।"

(৬) এমন অভ্যাস করিতে হইবে যেন অঘোর নিদ্রার সময়েও হাত কখনও নাভির নীচে না যায়। এই অভ্যাস করিবার নিয়ম হইল দিবাভাগে মাঝে মাঝে নিদ্রিত না হইয়া শয়ন করা এবং একখানা হাত মাথার নীচে এবং অপরখানা বুকে পার্শ্বদেশের উপর রক্ষা করা। অবশ্য এইরূপ অভ্যাস করিতে গিয়া যদি আবার দিবানিদ্রার অভ্যাস আসিয়া যায়, তবে বিপদই ঘটিবে। সুতরাং সতর্ক থাকিয়া এইরূপ শয়নাভ্যাস করিবে।

(৭) শয়নের পূর্ব্বে নামজপকালে মনকে সর্ব্বদা ভ্রূমধ্যে রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহা দ্বারা হস্তদ্বয় নাভির উপরে রাখিবার গৌণ সহায়তা হইবে। মন উপস্থে থাকিলে হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে রাখিবার সঙ্কল্প সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারেই উপস্থকেই আশ্রয় করে। এইজন্য মনকে সর্ব্বদা ভ্রূমধ্যে * রাখিবার চেষ্টা ক'

* সংযম-সাধনা, দ্বাদশ সংস্করণ, ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিবেই, পরন্তু বিশেষভাবে ইহা আবশ্যক হইবে শয়নের পূর্ব্বে নামজপ করিবার সময়ে। রাত্রিতে ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশ করিতে গেলে যদি কাহারও নিদ্রালুতার সম্ভাবনা ঘটে, তবে সে দীর্ঘকাল অবিরত জগন্মঙ্গল পরিভ্রমণ * করিয়া তৎপরে ভ্রূমধ্যে মনঃসন্নিবেশ করিবে।

(৮) কুঁচকি, জননেন্দ্রিয়, অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে কোনও প্রকার চুলকণা, দদ্রু প্রভৃতি উৎপন্ন হইতে দিবে না। এই সব রোগের লক্ষণ দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং সর্ব্বদাই এই সকল স্থান খুব পরিষ্কার রাখিবে। এই সকল রোগ অনেক সময়ে কদভ্যাসের জনক হইয়া থাকে।

অনেকে নিদ্রাবস্থায় হস্তদ্বয়কে শাসনে রাখিতে সমর্থ হইয়াও নিজের অজ্ঞাতসারেই অন্যবিধ অঙ্গক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের হানি করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে কদভ্যাস দূর করিবার উপায়,—

(১) কোলবালিশ ব্যবহার না করা।

(২) কঠিন শয্যায় শয়ন করা।

(৩) উপুড় হইয়া না ঘুমান।

(৪) যখনই শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িবে, তখনই চিন্তা করিতে থাকা, যেন তোমার জননী এই শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।

---

* সংযম-সাধনা দ্বাদশ সংস্করণ ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) শয়নকালে মনে মনে চিন্তা করা, যেন তুমি তোমার জননীর কোলে আত্মসমর্পণ করিয়াছ।

(৬) নাভি হইতে গুহ্যমূল পর্য্যন্ত অঙ্গটুকুর মধ্যে যেন হিমালয়ের শীতলতম তুষাররাশি স্তূপীকৃত হইয়া সজ্জিত রহিয়াছে, এইরূপ ধ্যান করা।

(৭) এবং ইহার দ্বারাও কদভ্যাস দূরীভূত না হইলে, যাহার সহিত একাসনে উপবেশনেও সম্ভ্রম বোধ হয়, এমন কোনও পরম জিতেন্দ্রিয় গুরুজনের পদতলে শয়ন।

একক শয়ন

একাকী এক শয্যায় শয়ন করিবে। যতই অসুবিধা সহ্য করিতে হউক না কেন, অপরের সহিত কখনও এক শয্যায় শয়ন করিবে না। তাহার কারণ এই যে,—

(১) দিবাভাগে যাহার চিত্তের কদর্য্য সংস্কারসমূহ মাথা তুলিতে পারে নাই, নিশাকালে অনেক সময় তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়।

(২) নিদ্রাবস্থা তামসিকতার অবস্থা, এই অবস্থাতে কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিলে একের কদর্য্য চিত্তভাব অজ্ঞাতসারে অপরের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পরে।

ভারতের কত ফুলের মত সুন্দর,সরল-চিত্ত সুকুমার শিশু যে অপরের সহিত এক শয্যায় শয়নের মাহাত্ম্যে চিরতরে

জাহান্নামে গিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে ? কত বালক-বালিকা পূর্ব্বে যাহা জানিত না, অপরের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া তাহা জানিয়াছে, তাহা শিখিয়াছে, তাহার অনুশীলন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত করিয়াছে। চাকর-চাকরাণীর সহিত ঘুমাইয়া, বন্ধু বান্ধবের সহিত ঘুমাইয়া, আত্মীয় কুটুম্বের সহিত ঘুমাইয়া কত জন যে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছে, দাদার শালা, পিশার ভাই, মামার বন্ধু এবং গৃহ শিক্ষকের সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়া কতজন যে নিজের শিরে নিজে বজ্র হানিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। অতএব দৃঢ় সঙ্কল্প করিবে,— পৃথক্ শয্যার অভাবে বরং মাতা বসুমতীর উন্মুক্ত বক্ষে আশ্রয় লইবে বা বসিয়া, দাঁড়াইয়া, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিবে কিন্তু তথাপি কোনও ক্রমেই অপরের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না।

ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়

১। উপাসনা-কালে বাক্যালাপ।

২। ব্যায়াম–কালে দৃঢ়তার অভাব।

৩। অধ্যয়নকালে অমনোযোগ।

ব্রহ্মচারীর বর্জ্জনীয়

৪। স্নানকালে দেহ পরিষ্কার না করা।

৫। পান, চা, চুরুট, বিড়ি, নস্য, প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার।

৬। অপরের উচ্ছিষ্ট সেবন।

৭। অপরিমিত আহার, অনিয়মিত আহার, কদর্য্য উত্তেজক অপবিত্র ও অপকারী দ্রব্য আহার এবং লোভপূর্ব্বক আহার।

৮। নিমন্ত্রণ খাওয়া।

৯। অপরের ব্যবহৃত শয্যা-বস্ত্রাদি।

১০। প্রলোভনের সহিত ঘনিষ্ঠতা।

১১। বৃথা উপবাস।

১২। আলস্য, অতিশ্রম, ক্ষুধা বা মলমূত্র বেগধারণ-পূর্ব্বক ব্যায়াম ও পরিশ্রম, অসময়ে ব্যায়াম, আহারের পরই ব্যায়াম বা পরিশ্রম।

১৩। কুসঙ্গ, কুচিন্তা, পরানিষ্টচিন্তা এবং ক্রোধ।

১৪। অপ্রয়োজনীয় চিন্তা, অনধিকার চর্চ্চা, বিষণ্ণতা, আত্ম-অবিশ্বাস ও হতাশা।

১৫। কুচিত্র-দর্শন, কুগ্রন্থাধ্যয়ন, কুসঙ্গীত-শ্রবণ, বাচালতা।

১৬। চিৎ বা উপুড় হইয়া ঘুমান।

১৭। অতি-নিদ্রা, অল্প-নিদ্রা. অগভীর-নিদ্রা, দিবানিদ্রা, অপরের শয্যায় নিদ্রা এবং অপরের সহিত নিদ্রা।

১৮। জাগ্রত থাকিতে শয়ন, জাগিয়া ঘুমান, ঘুমাইতে ঘুমাইতে বাজে আলাপাদি করা।

১৯। উলঙ্গ হইয়া অবস্থান বা শয়ন এবং অপরকে উলঙ্গ করিবার চেষ্টা বা অপরকে নিজ উলঙ্গমূর্ত্তি প্রদর্শন।

২০। স্ত্রীলোকের অপবাদ করা বা স্ত্রীচরিত্রের দোষানুসন্ধান।

উপসংহার

অভ্যুদয়ের পথে অগ্রসর হইতে গিয়া মাঝে মাঝে দুই একবার পদস্খলিত হওয়া উন্নতিরই নিজস্ব প্রকৃতি। অতএব সাময়িক কোনও অপ্রত্যাশিত পতনে কখনও আত্মবিশ্বাস হারাইবে না বা নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাহীন হ ইবে না। হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গ যে আরোহণ করিতে চাহে, তাহাকে সহস্র সহস্র চড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করিতে হয়, একবার খুব কতখানি উর্দ্ধে উঠিয়া পুনরায় আবার হয়ত অনিচ্ছাসত্বে কতকটা অবতরণ করিতে হয়। এই জন্য হতাশ হইতে নাই, হাত পা ছাড়িয়া চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাবি
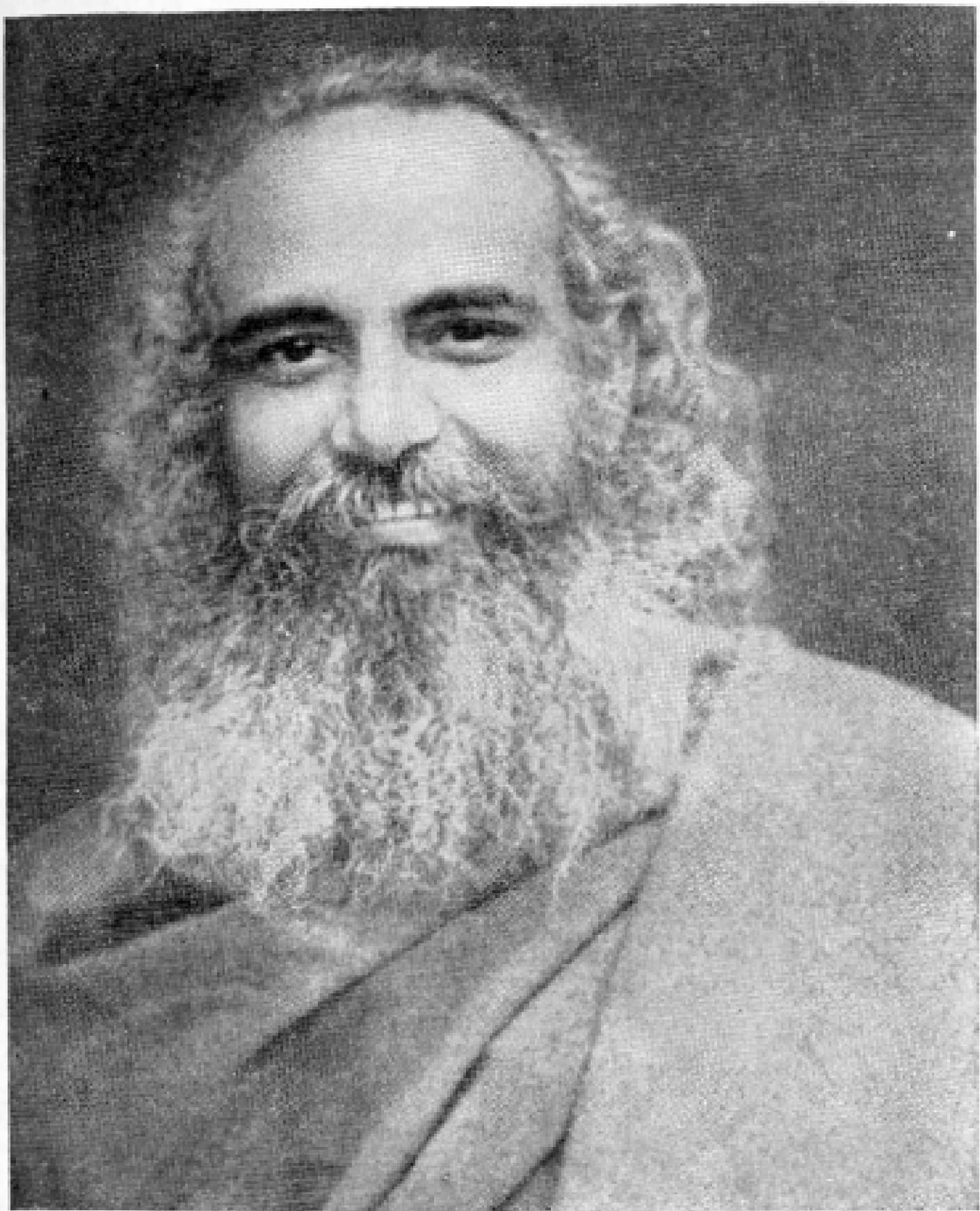
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ।

খাইবারও প্রয়োজন নাই। আকস্মিক পতনে বিন্দুমাত্রও অধীর না হইয়া সমান প্রযত্নে পথ অতিক্রমই করিয়া যাইতে থাক, আত্মগঠনে পূর্ব্ববৎ অধ্যবসায় ও পুরুষকার প্রয়োগ করিতে থাক, বাধা-বিপত্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হইয়া বিঘ্ন-বিভীষিকাকে গণনায় না আনিয়া কেবল অগ্রসরই হও।

যতদিন মানুষ দিব্য-স্বভাব প্রাপ্ত না হয়, নিজ প্রকৃতিকে ভগবানের পরমারাম নাম-সাধনের দ্বারা যতদিন না মানব ত্রিগুণাতীত ব্রাহ্মী প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত "পাপ করিব না" বলিয়াও তাহার মন বারংবার পাপাচরণেই অগ্রসর হয়। তোমার জীবনেও যদি এইরূপ ঘটে, তথাপি তুমি হাল ছাড়িও না। শক্ত করিয়া হাল ধর আর সকল বিঘ্ন-বিপদের আক্রুষ্ট গর্জ্জনের মধ্যেও চোখ বুজিয়া শুধু নাম-সাধন করিয়া যাও। নৌকা ডুবে ডুবুক, ভাসে ভাসুক, ভাঙ্গে ভাঙ্গুক বা তাহার ভাগ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, তুমি নাম ছাড়িও না, অশরণের যাহা পরম শরণ, দীনজনের যাহা পরম বান্ধব, তাহা ভ্রমবশেও পরিত্যাগ করিও না। নামের বলে ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত ঝটিকা স্নিগ্ধ মলয়ে পরিণত হইবে, তামসিকী প্রকৃতি সাত্ত্বিকতা লাভ করিবে, পাশব সংস্কারনিচয় দেব-স্বভাবের পদতলে আত্মবলি দিবে, নামের বিদ্যুৎ তোমার মনকে পাপবুদ্ধির প্রভাবাতীত করিবে, নামের তেজ তোমার মনকে সঙ্কল্পের সত্যসিদ্ধতায় বিমণ্ডিত করিবে।

উন্নতির পথে কখন কখন নবীন সাধকের এমন অবস্থা হয় যে, লালসা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা নিজে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াও তাহা দমন করিতে পারা যায় না। ইহাতেও ভীত হইও না। পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া অখণ্ড আস্থা সহকারে মনে প্রাণে নামের সেবা করিতে থাক, তোমার ইচ্ছা ভোগবাসনাকে বজ্রাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবে।

উন্নতিপথচারী প্রথম সাধকের জীবনে কখনো কখনো এমনও ঘটে যে, পাপাচরণ করিতে আদৌ ইচ্ছা নাই, অথচ কে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক ঘৃণিত কার্য্যে নিয়োজিত করে। এই অবস্থাতেও নিজের উপর আস্থা হারাইও না, প্রচ্ছন্ন পূর্ব্বসংস্কারের নাকাদড়ির টানে সহসা পথচ্যুত হইতে বাধ্য হইয়াও নিজের ভবিষ্যৎকে অবিশ্বাস করিও না,—প্রাণ-পণে নাম করিতে থাক, নামের বহ্নি তোমার ভোগ-সংস্কারের সকল প্রচ্ছন্ন বন্ধন পুড়াইয়া দিবে, যে অদৃশ্য শক্তি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অকল্যাণে নিয়োজিত করিতে চাহিতেছে, তাহাকে সমূলে উচ্ছেদ করিবে, সবংশে তাহার নির্ব্বংশ সাধন করিবে।

অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়গণ নিরীহ মেষশাবকের ন্যায় দীর্ঘকাল শান্তভাবে থাকিয়া সহসা হয়ত একদিন নেকড়ে বাঘের পালের মত উত্তেজিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ

করে। এইরূপ বিপৎপাতেও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িও না, সাহস হারাইও না, প্রবল বিক্রমে নামের অসি পরিচালনা করিতে থাক, অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ে দিনের পর দিন নামের খড়্গে ধার দাও, আর সবলে তাহার দ্বারা রিপুকুলকে লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিতে থাক। দেখিবে, অল্পকাল মধ্যেই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, তোমার ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘকৃষ্ণ বিষণ্ণ আকাশে নবজীবনের হাস্যময় রবিচ্ছবি প্রসন্ন কিরণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনেকবার হয়ত ভয়ানক উত্তেজনা অগ্রাহ্য করিয়া একটা সামান্য উত্তেজনাতেই পরাজিত হইতে হয়, অনেকবার হয়ত দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন অনায়াসে দমন করিয়া একটা তুচ্ছ প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এই রকমও যদি ঘটে, তথাপি নিরাশ হইও না। মনপ্রাণ নামের প্রবাহে ছাড়িয়া দাও, নামের স্রোতে নিজকে ভাসাইয়া দাও,—নামের ধারা তোমাকে পরমপুণ্যাধার প্রেমসমুদ্রে নিয়া ফেলিবেই। ছোট বড় সকল প্রলোভনকে দমন করিবার শক্তি, ছোট বড় সকল উত্তেজনাকে শান্ত করিবার সামর্থ্য তুমি নামেরই কৃপা-বলে লাভ করিবে। পাপাচার তোমার গালে চুণকালি মাখিয়া দিলেও তুমি নাম ছাড়িও না, কেন না নামই তোমার কলঙ্ক-ভঞ্জন করিবে ; কুৎসিত আসক্তি তোমার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরাইয়া দিলেও তুমি নাম ছাড়িও না কেননা নামই তোমার এ ফাঁসীর দড়ি কাটিয়া দিবে।

কত সময়ে হৃদয়ে উৎসাহ অনুভব কর, আত্মগঠনে এবং আত্মজয়ে প্রবল উদ্যমে লাগিয়া যাও, কিন্তু হয়ত উৎসাহ স্থায়ী হইল না, হয়ত উৎসাহের দীপ্তি দুইদিন যাইতে না যাইতেই নিবিয়া গেল, যে জোয়ার দুকুল প্লাবিয়া বহিতেছিল, দেখিতে না দেখিতে তাহা ভাটার টানে শুকাইয়া গেল। কিন্তু তবুও দমিয়া যাইও না। জোয়ার ভাটায়, সকল অবস্থায় নামের সঙ্গেই যুক্ত হইয়া থাক, নাম তোমার মেরুদণ্ডে বল দিবে, চির উৎসাহে অফুরন্ত উৎসের পানে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে, যাহা লাভ করিলে উৎসাহের বানে আর কখনও ভাটা বহে না, সেই অমর-দুর্ল্লভ বস্তু তোমার পক্ষে সহজ-প্রাপ্য করিবে।

কতবার হয়ত মনের মধ্যে কুযুক্তির উদ্ভব হইবে যে, মহৎ হইয়া ধরা-মাঝে বীরের ন্যায় বাস করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, আমারও বুঝি তাহা হইয়া উঠিবে না, জগতের সকলেই যদি সৎ হইয়া যায়, তবে অসৎ থাকিবে কে? এসব কুযুক্তি তোমার দুর্ব্বলতারই সন্ততি, ইহারা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। শত কুযুক্তি মনে উঠুক, তুমি নাম ছাড়িও না, নাম ভুলিও না, অবিরত তুমি নাম জপিতে থাক, প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাস তুমি ভগবানের নামের পাদপদ্মে সমর্পণ কর, নামের কৃপা তোমাকে ভগবৎ-কৃপার অধিকারী করিবে, তোমার দুর্ব্বলতা নাশ করিবে, তোমাকে শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ করিবে, তোমাকে মহত্ত্ব দিবে, তোমাকে বীরত্ব দিবে, তোমাকে পৌরুষ দিবে।

উপসংহার

নামের শক্তিতে এই দেশ উঠিবে, নামের শক্তিতে এই দেশ জাগিবে, নামের শক্তিতে এই দেশ তার হারান নিধি ফিরিয়া পাইবে। ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের দ্বারা নয়, ধর্ম্মের চটকে নয়, ধর্ম্মের জাকজমকে নয়, অকপট, অনাড়ম্বর, নীরব নাম-সাধনাই ভারত-সন্তানকে তার ঘৃণ্য নীচতা হইতে রক্ষা করিবে, বিষ্ঠার কৃমিকীটকে দেবপূজায় উৎসর্গ-যোগ্য প্রস্ফুটিত প্রসূনে পরিণত করিবে, হীন স্বার্থপরতার পাপপঙ্কসেবী জঘন্যতম জীবকে নিঃস্বার্থ দেশসেবার প্রকৃত যোগ্যতা দান করিবে। হে ব্রহ্মচারী, ভুলিও না, নামের নিবিড় সাধনা তোমার ব্রহ্মচর্য্যের মূল। হে বীর, ভুলিও না, নামের গভীর সাধনা তোমার বীরত্বের উৎস। হে স্বদেশসেবক, ভুলিও না, নামের গোপন সাধনা তোমার সেবাধর্ম্মের প্রাণ। যাহারা তোমার কর্ম্মজীবনের সহযোগী, হয়ত তাহারা নামের শক্তিতে বিশ্বাসী নহে, নামের মহিমায় আস্থাবান্ নহে, কিন্তু এই বিষয় লইয়া তাহাদের সহিত তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই, যে যেই মহাকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, সে তাহাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হও, কিন্তু নামযোগে নিয়ত সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীভগবানের অপার্থিব শক্তির সহিত নিজেকে অতি নীরবে, অতি গোপনে, প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপের সহিত, প্রত্যেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে, প্রত্যেকটি হৃৎস্পন্দনের ধ্বনিতে যুক্ত রাখিতে ভুলিও না। জীবনোৎসর্গই ত' মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সত্য সাধনা, কিন্তু—

আদর্শ ছাত্র-জীবন

আগে জাগা নিজের প্রাণ
তবে ত' ভাই উঠ্‌বে জেগে
বিশ্বজগৎখান্‌ ।

চিত্ত যদি রইল ডুবে
মোহের তিমির মাঝে,
জাগ্‌বে ত্রিভুবন কিরে তোর
দেহের বাহ্য সাজে ?
ভুলবে না কেউ কপট সাধুর
দেখে বিপুল ভাণ !

দেশের কাজে দশের কাজে
করলি ডাকাডাকি,
ডাকলি না ত' দিলি কেবল
নিজের কাজে ফাঁকি,
কেউ দিল না হায়রে সাড়া
শুনেও তোর আহ্বান ।

প্রাণ দিবি ত' প্রাণের মূল্য
বাড়িয়ে নে ভাই আগে,
মরা প্রাণের বিসর্জ্জনে
দেশের প্রাণ কি জাগে ?
জীবন্ত প্রাণ বলিই হ'ল
আসল আত্মদান !

উপসংহার

কিন্তু প্রাণের মূল্য বাড়াইবার উপায় কি? প্রাণের মূল্য বাড়াইবার অভ্রান্ত উপায় শ্রীভগবানের নাম। ভগবানের নামের সেবা যে ব্যক্তি অকপট নিষ্ঠা সহকারে করেন, বাঁচিয়া থাকিলেও তাঁহার জীবন দিয়া অধিকতর হিত হয়, জীবন বিসর্জ্জন করিলেও তাঁহার মরণ দিয়া জগতের প্রভূততর কল্যাণ সাধিত হয়। জিয়ন্তে বা মৃতে, সর্ব্বাবস্থায় তিনি সর্ব্বজীবের মঙ্গল বিধাতা, সর্ব্বজাতির কল্যাণকারী।

অবিশ্বাসীরা আসিয়া কহিল, "নাম ক'রে কিবা হবে,
নামের চাইতে অধিক মধুর বস্তু আছে এ ভবে।
আছে সন্দেশ, পায়েস, পিঠা ও মিশ্রি, বাতাসা, চিনি।"—
আমি বলি,—"শোন, নামের অমিয় মধুর এসব জিনি'।
বাহির ভিতর মিঠাইয়া দেয়, সু-মধুর করে সব,
কর্ম্মে, ধর্ম্মে করে সু-বিজয়ী বিদূরিয়া পরাভব।
মৃত্যু মথিয়া অমৃত নিঙাড়ে, দুঃখ মথিয়া প্রাণ,
আপন কুশলে, জগতের হিতে দিতে করে আগুয়ান।
শুধু নাম নহে, কামানের গোলা, শব্দভেদী এ বাণ,
জগতের যত অত্যাচারেরে কাটি' করে খান্-খান্।
নামের অমৃতে বজ্র মিশানো, বিদ্যুৎ অবিরাম
পুরুষকার অধ্যবসায়ে রচিছে নিত্য ধাম;

ইহ জগতেরে পারত্রিকের সঙ্গে গাঁথিয়া নিয়া
মৃত্যু-ভীতেরে মৃত্যুঞ্জয় করিছে বীর্য্য দিয়া ;
নিজ মহিমায় দীপ্তোজ্জ্বল নামের শরণ লও,
যত কাপুরুষ, দুর্ব্বল, ভীরু সত্য মানুষ হও ॥"

আজ তোমাদের সত্য মানুষ হইতে হইবে, মানুষের পোষাকপরা কতকগুলি জন্তুর বিচরণে মাতা বসুন্ধরা বড়ই পরিক্লান্তা হইয়াছেন, আজ তোমাদের এমন মানুষ হইতে হইবে, যাহাদের চরণ-স্পর্শে ধরিত্রীর সর্ব্ব পাপ নিবারিত হয়, সর্ব্বতাপ দূরীভূত হয়, সর্ব্ব ক্লেশ নাশ পায়। তাই আজ তোমাদিগকে ছাত্র-জীবনেই সুকঠোর তপস্যায় আত্ম-নিমজ্জন করিতে হইবে।

(সমাপ্ত)

আত্মজয়ের
বিদ্যাই
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।
আত্মজয়ী যে,
বিশ্বজয়ী সে।

—স্বরূপানন্দ—

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। সরল ব্রহ্মচর্য্য ১'৫০
২। অসংযমের মূলোচ্ছেদ ১'০০
৩। জীবনের প্রথম প্রভাত ১'০০
৪। আদর্শ ছাত্র-জীবন ১'৫০
৫। আত্ম-গঠন ৩'৫০
৬। সংযম-সাধনা ৩'৫০
৭। দিনলিপি ১'৫০
৮। স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব ১'৫০
৯। প্রবুদ্ধ-যৌবন ১'৫০
১০। কুমারীর পবিত্রতা (১ম হইতে ষষ্ঠ খণ্ড) প্রতিটি ১'০০
১১। নবযুগের নারী ১'০০
১২। গুরু (চতুর্থ সংস্করণ) ৭'০০
১৩। অখণ্ড-সংহিতা ১ম হইতে ২৪শ খণ্ড, ধর্ম্মার্থ শুল্ক প্রতিটি ১০'০০
১৪। মন্দির [গানের বই] ৫'০০
১৫। মূর্চ্ছনা [গানের বই] ৫'০০
১৬। মঙ্গল-মুরলী [গানের বই] ৫'০০
১৭। মধুমল্লার [গানের বই] ৫'০০
১৮। সমবেত উপাসনা ২'০০
১৯। নববর্ষের বাণী ৩'০০
২০। বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য ১০'০০
২১। বিবাহিতের জীবন-সাধনা ৬'০০
২২। সধবার সংযম ৬'০০
২৩। বিধবার জীবন-যজ্ঞ ২'০০
২৪। কর্ম্মের পথে ২'০০
২৫। কর্ম্ম-ভেরী ১'৫০
২৬। আপনার জন ৩'০০
২৭। পথের সাথী ২'০০
২৮। পথের সন্ধান ৩'৫০
২৯। পথের সঞ্চয় ১'৫০
৩০। সাধন-পথে ২'০০
৩১। ধৃতং প্রেম্না [১ম হইতে ৩৮শ খণ্ড প্রতিটি ১'৫০
৩২। বন-পাহাড়ের চিঠি [১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড] প্রতিটি ১'৫০
৩৩। শান্তির বারতা [১ম হইতে ৩য় খণ্ড] প্রতিটি ১'৫০
৩৪। সর্পাঘাতের চিকিৎসা ১'০০
৩৫। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ২'০০
৩৬। সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ ৩'০০
৩৭। His Holy Words 1·00

হিন্দি অনুবাদ ঃ—১। কর্ম্মের পথে ১'৫০ ২। সংযম-সাধনা ২'৫০ ৩। আত্মগঠন ২'০০ ৪। কুমারীর পবিত্রতা ২'০০ ৫। সরল ব্রহ্মচর্য্য ১'০০ ৬। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা ২'০০

অর্ডারের সহিত অগ্রিম মূল্য পাঠাইলে ডাকব্যয় ভিঃ পিঃ করা হয়।

অযাচক আশ্রম, ডি ২৬।১৭বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০